উত্তর বাংলার সেরা ওয়েব ম্যাগাজিন www.ekhondooars.com

মে ২০২১। মূল্য ২০ টাকা

এখন ডুয়ার্স

উত্তরে বাংলার মুক্ত কণ্ঠ

জল। জঙ্গল। জনসত্তা

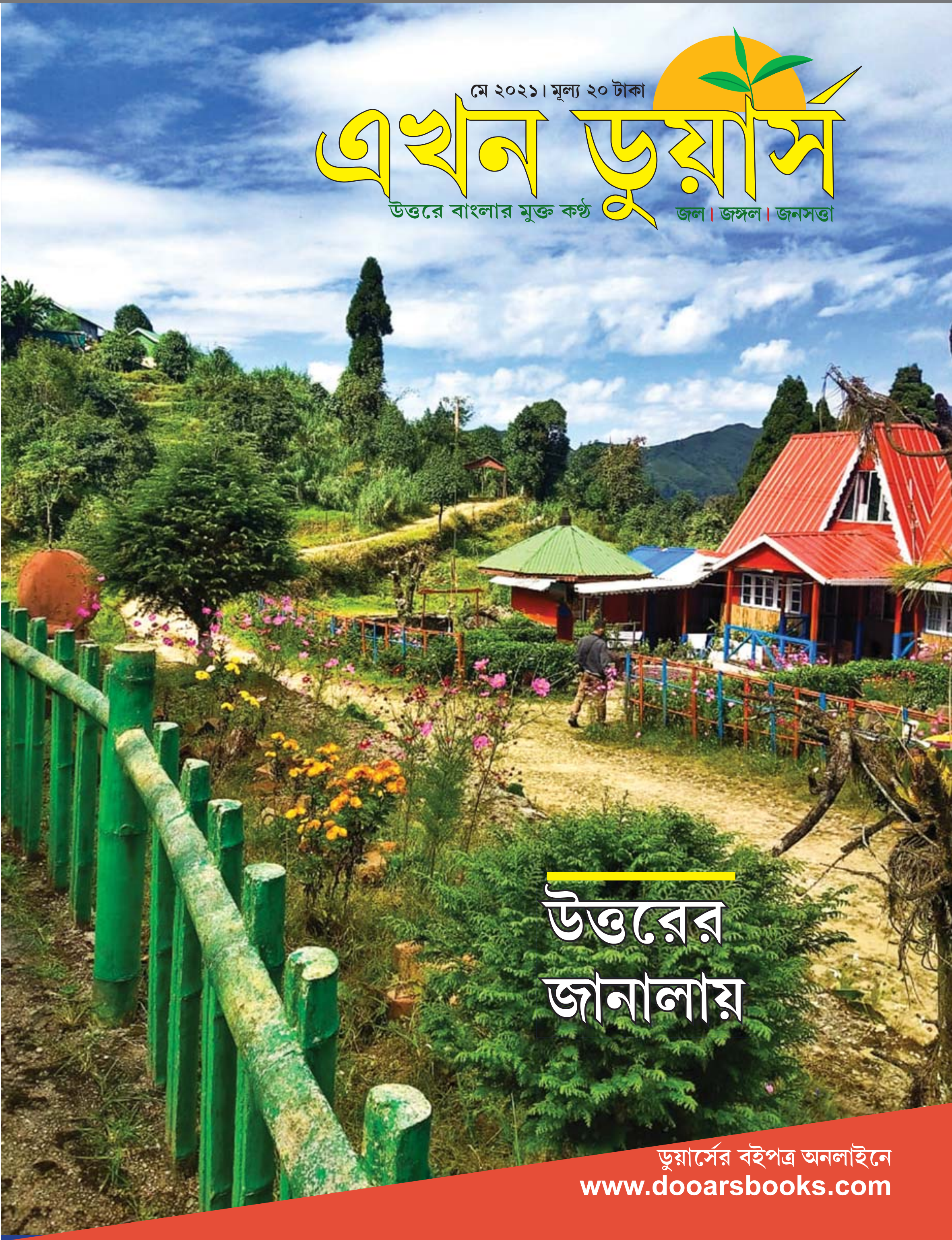

উত্তরের জানালায়

ডুয়ার্সের বইপত্র অনলাইনে
www.dooarsbooks.com

এখন ডুয়ার্স

অষ্টম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে ২০২১

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

সাহিত্য বিভাগ সম্পাদনা
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদনা
শ্বেতা সরখেল

বিন্যাস
শান্তনু সরকার

সার্কুলেশন
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ইমেল
ekhonduars@yahoo.com

সম্পাদকীয় দপ্তর সনাতন অ্যাপার্টমেন্ট, পাহাড়ি পাড়া, কদমতলা, জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

প্রচ্ছদ ডাঃ শর্মিলা গুপ্ত

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সম্পাদকের চিঠি ৩

পর্যটন
চটকদার পাহাড়ি গাঁও চটকপুর ৪
আনকোরা ডুয়ার্সে নদীতে পা দিলেই ভুটান! ৩২

বিশেষ নিবন্ধ
প্রাচীন শিলা-প্রস্তর-তাম্রলিপিতে উত্তরবঙ্গ ৭

একুশের রাজনীতি
ছাঁচের বাইরে বামপন্থা সর্বকালেই আত্মহন্তা ১০

ধারাবাহিক প্রতিবেদন
গ্রামীণ ব্যাংক ও উত্তরের উত্তরণ লিপি ২৪

মুর্শিদাবাদ মেইল
বাংলার বারাণসী বড়নগর ২৮

ধারাবাহিক উপন্যাস।
ডাউন হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট ৩৬

অলৌকিক কাহিনি।
খেলনা ৪৫

ল্যাব ডিটেকটিভ ৫৪

আমচরিত কথা। প্রাইভেটে লেখাপড়া ৫০

শ্রীমতি ডুয়ার্স
বিজ্ঞানের দুনিয়ায় ভারতীয় নারী। রাজেশ্বরী চট্টোপাধ্যায় ১৮
পাতাবাহার ৬১
পুরাণের নারী। রাজমহিষী সুদেষ্ণা ৬২

উত্তরের জানালায় উত্তরের খোঁজে

নির্বাচনী ঝড়ে ভাসছিল বাংলা। সে ঝড় কমতেই কোভিডের দ্বিতীয় ঝড়, যার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না আমরা। ফলত খবরের পর্দায় সারি সারি জ্বলন্ত চিতার ছবিতে আতঙ্কিত মধ্যবিত্ত আবার তার মধ্যপ্রদেশের স্ফীতি নিয়ে উদবিগ্ন হয়ে পড়েছে। অন্তত হাসপাতালের কাগজে কলমে দেখা যাচ্ছে আশপাশের যে টপাটপ মৃত্যু ঘটছে তাদের সবার শরীরেই মিলছে কোভিডের বিষ। অসুস্থতার আরেক নাম এখন কোভিড পজিটিভ, সুস্থতার আরেক নাম 'বি নিগেটিভ'। সিস্টেম নড়বড়ে হলেই যে কোভিড ও কোভিড-সৃষ্ট আতঙ্কের কালো চাদর উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে তোমার আমার সাধের প্রাণ! গেলবারের গৃহবন্দীকালে নিগেটিভ থাকার বাসনায় সিস্টেম শুদ্ধ করবার যে প্রয়াস শুরু করেছিল শহরের মধ্যবিত্ত, তাতে ইদানিং কিঞ্চিৎ ভাটা পড়েছিল বইকি। সরকারের ইচ্ছা মোতাবেক ইমিউনিটি আর কোয়ারেন্টাইন এই শব্দদুটিতে আবার বিশ্বাস ফিরে আসছে, নাস্তিকের ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরবার মত করে।

বাঁচবার বাসনায় আজ প্রবল আর্তি জন্মেছে অক্সিজেনের প্রতি, সোশ্যাল মিডিয়ায় রচিত হচ্ছে শত শত আবেগ ও অক্সিজেন ভরা সাহিত্য। সত্যিই কি আমাকে অক্সিজেন সরবরাহের দায়িত্ব কেবল সরকারের উপরই বর্তায়! গত এক শতাব্দী ধরে যেভাবে নিজের হাতে জঙ্গল কেটে জলাশয় বুজিয়ে ঘরবাড়ি তুলেছি, গাছ কেটে সুদৃশ্য আসবাব বানিয়েছি, বাগান সাফ করে ইমারত তুলেছি, কই কোনও সরকার তো কখনও বাধা দেয় নি! তবু আজ আমার বুড়ো বাপটা কিংবা বাচ্চা ছাওয়াটা হাসপাতালে খাবি খেতে থাকলে তাঁকে অক্সিজেন জোগানোর দায়িত্ব কি কেবল সেই সরকারেরই? না হলেই বিক্ষোভের আগুন জ্বলবে, শহীদের বেদীতে ফুল চড়াবে বিপ্লবী বাংলা? এমনটাই তো দেখে আসছি জন্ম ইস্তক! এমনটাই কি দেখে যেতে হবে মৃত্যু তক্, হে প্রভু?

কিন্তু এর পাশাপাশি মূঢ় অসচেতন-অর্থবান-অর্ধশিক্ষিত মানুষদের প্রকৃতিতে অক্সিজেন খোঁজার তাগিদ কি বাড়বে? তাঁদের মাথায় কি প্রশ্ন আসবে না— অক্সিজেন ছাড়া শুধু ইমিউনিটি বা কোয়ারেন্টাইন কি রক্ষা করতে পারে মানুষকে? বোধহীন জননেতাদের কি বোধগম্য হয় না যে ফুসফুসের নিয়মিত যত্ন না নিলে মানুষের জন্য তার হৃদয় শত ভেউ ভেউ কাঁদলেও তার হৃদযন্ত্রটি বিকল হতে পারে যে কোনও সময়? তবে কি এবার নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষায় ঘরে ঘরে অক্সিজেন সিলিন্ডার সাপ্লাই হবে র‍্যাশন কার্ড দেখে? পাড়ায় পাড়ায় অক্সিজেন পার্লারের ছড়াছড়ি বাড়বে? অক্সিজেন সালোনে ইনভেস্ট করবে বড় বড় ব্র্যান্ড? না কি গাঁটের কড়ি খরচ করে নিয়মিত সপরিবারে বেরিয়ে পড়বার তাগিদ বাড়বে শুদ্ধ দেশি অক্সিজেনের খোঁজে?

আজ দক্ষিণে প্রখর গ্রীষ্মের দাবদাহে কোভিডের দুনিয়ায় বাংলার উত্তরে বইছে হিমেল বাতাস, বিশুদ্ধ অক্সিজেন প্লাবনে কোয়ারেন্টাইন এখানে মধুর। বাংলার উত্তরেই মিলছে যাবতীয় ইমিউনিটির সন্ধান। বাংলার উত্তরে ডুয়ার্স-তরাই-হিমালয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিনির্ভর ইকোপর্যটনের প্রসার কেবল এই কোটি কোটি মধ্যবিত্তের সুস্থভাবে বেঁচে থাকবার বাসনাতেই সফল হয়ে উঠতে পারে। সমতলের বিরুদ্ধে যাবতীয় বঞ্চনা ও শোষণের অভিযোগের অবসান ঘটাতে পারে উত্তর বাংলার পাহাড়ি অচিন গ্রামগুলি, যেখানে অতিথিকে দেবতা মানা হয়। ডুয়ার্সের অভিভাবকহীন নদীগুলির সংরক্ষণ, জঙ্গলে মনুষস্যবসতি বিস্তারে কঠোর আইন, সীমান্তে বন্যপ্রাণ পাচারে নাকাবন্দি এবং সর্বোপরি লোকশিল্পের ঐতিহ্যকে রক্ষার শপথ নিলে তার বিনিময়েই শহুরে ক্ষত বিক্ষত ফুসফুসে মিলতে পারে অবাধ অক্সিজেন। মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারবে কীভাবে তার উত্তর আজ মিলতে পারে এই উত্তরের জানালায় বসেই।

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্স থেকে দূরে নয়

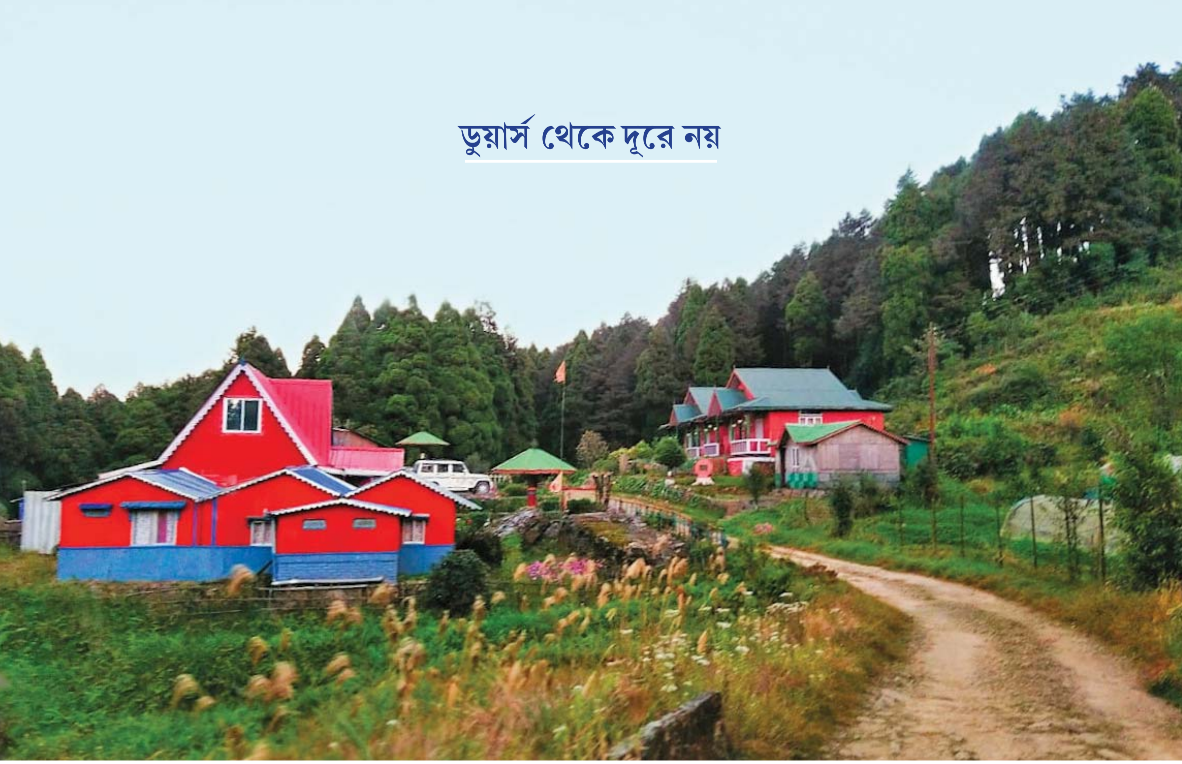

চটকদার পাহাড়ি গাঁও চটকপুর

ডাঃ শর্মিলা গুপ্ত

গত ষষ্ঠীর দিন অকস্মাৎ একটা যোগাযোগ হওয়াতে গেলাম চটকপুর। এতদিন চটকপুরের কথা পড়ে ও শুনে থাকলেও বাগোরা অবধি গিয়েছি, আর দার্জিলিং তো কতবার যাই, কিন্তু চটকপুর যাওয়া হয় নি। রেড ক্রসবিল একটা ছোট লালরঙের পাখি, তারই ছবির সন্ধানে অচিন্ত্য যাবে চটকপুর। দার্জিলিং-এ তার একটা কনফারেন্সও আছে। সুতরাং আমি ও ছেলেও সঙ্গে চললাম। তার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ এক পরিবারের তিনজন।

চটকপুরের উচ্চতা ৭৮৮৭ ফুট, এনজেপি থেকে ৬৪ কিমি, দার্জিলিং থেকে ২২-২৪ কিমি আর সোনাদা থেকে ৭ কিমি। দার্জিলিং থেকে গেলে পেশক হয়ে একটা রাস্তা, সোনাদা থেকে সোজা উপরে উঠেছে একটা রাস্তা, আর দিলারাম থেকে ভায়া বাগোরা আর একটা রাস্তা। এনজেপি থেকে এলে এই রাস্তাতেই সুবিধে।

কার্শিয়াং টুরিস্ট লজের রেস্তোরাঁয় বা টুং-এর মার্গারেট ডেস্ক-এ ব্রেকফাস্ট সেরে নিন। বাগোরার পর রাস্তা সেঞ্চল ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারীর মধ্যে দিয়ে। কাঁচা রাস্তাই প্রায়, বোল্ডার ফেলা শেষের দিকে। সেলফ ড্রাইভে না যাওয়াই ভালো। এসইউভি এই রাস্তায় সহজে চলে।

এটুকুই মানলে বাকিটা প্রাপ্তি।

রাস্তার দু'দিকে ঘন জঙ্গল। পাইনবন। বিশাল সব ফার্ণ, সরু বাঁশঝাড়। ডালপালা ঢুকে পড়ে গাড়িতে। ঝিঁঝির কোরাস আর হরেকরকম পাখির মিষ্টি ডাক।

একধরনের কারিপাতার মতো মাঝারি উচ্চতার গাছে প্রচুর ছড়া ছড়া হলুদ ফুল ফুটেছে দেখলাম। ফিকে বেগুনি আর কাঁচা হলুদ, সাদা রঙের বুনোফুল অজস্র।

চোখে পড়ল বনমুরগি, ছোট তিরতিরে ঝোরার ধারে ব্লু হুইস্লিং থ্রাস আর কয়েকটি বার্কিং ডিয়ার, তার মধ্যে একটি শান্তশিষ্ট, দিব্যি ছবিতে ধরা দিয়ে ধীরেসুস্থে রাস্তা পেরোল। ড্রাইভার সাহেব বললেন চিতাবাঘ বা ভালুকও নাকি এপথে দেখা যায়!

ছোট ছোট ঝর্ণা দেখলাম কয়েকটি। এসব দেখতে দেখতে চটকপুর পৌঁছে গেলাম। রাস্তায় একটা ছোট্ট চেকপোস্ট আছে। এন্ট্রি করাতে হয়।

চটকপুর ঢোকার ঠিক আগে দুটো পুরনো রং জ্বলা চোর্তেন। কখনও হয়ত রং লাল ছিল। কুয়াশার আর জঙ্গলের মাঝে বেশ চোখ টানে। নীচের ভিউও দারুণ। ছবি তুললাম। আর তার থেকে একটু এগিয়েই দেখি বাঁদিকে মাথা উঁচু করে বিকেলের কমলা আলোয় প্রসাধিত... কাঞ্চনজঙ্ঘা!

'ওয়েলকাম টু চটকপুর' লেখা একটি গেট। তার সামান্য আগে গাড়ি দাঁড় করালাম। প্রাণ ভরে দেখলাম আর ছবি তুললাম। পারমিতারাও (আমার সঙ্গী পরিবার) এই শোভা দেখে মন্ত্রমুগ্ধ! বিকেলের রাঙা আলোয় কী সুন্দরই না লাগছে! এতবার দেখি তবু মন ভরে না!

এরপর সেই গেট পেরোতেই দেখি উজ্জ্বল কয়েকটি ঘরবাড়ি। পৌঁছে গেলাম ফরেস্ট রেস্ট হাউসে।

সরু রাস্তা চলে গেছে আরো কিছু দূরে 'কালাপোখরি' পর্যন্ত। এটা লোয়ার চটকপুর। কয়েকটি মাত্র ঘর, ফরেস্ট রেস্টহাউস আর ধনমায়া হোমস্টে। সবজি বাগান, নার্সারি। রেস্ট হাউসের দুটি দুটি চারটে কটেজ। আমরা বাঁদিকের দুটি কটেজে থাকলাম। দুটির মাঝখানে ভিউ পয়েন্ট ও আপার চটকপুরের গ্রামে যাওয়ার পায়ে চলা পথ। ওপরের গ্রামেও কয়েকটি হোমস্টে। সেখান থেকে সরাসরি দিনরাত কাঞ্চনজঙ্ঘা... অবশ্য অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মেলে সেই দুর্লভ দৃশ্য।

চটকপুরে প্রকৃতিই একমাত্র আকর্ষণ। অনধিক তিরিশ ঘর বাসিন্দা। তাদের আয়ের উৎস বলতে অর্গানিক ফার্মিং, মেডিসিনাল প্ল্যান্ট, পোল্ট্রি, হ্যাচারি ইত্যাদি। আর হোমস্টে। বিনোদ রাই ফরেস্ট রেস্ট হাউসের তদারক করেন। খুব হাসিখুশি। বার্ডিংএর গাইডও উনি। আমরা যেতেই হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিলেন। আর গরম চা-বিস্কুট। ঘরগুলো খুব পরিষ্কার। বিছানাপত্রও। ঝকঝকে ওয়াশ রুমে গিজারও মজুত।

আমরা অবশ্য নিউ নর্মাল-এ চাদর বালিশের কভার টাওয়েল এসব নিয়ে গেছিলাম। ঘরে ভালো

চটকপুরে প্রকৃতিই একমাত্র আকর্ষণ। অনধিক তিরিশ ঘর বাসিন্দা। তাদের আয়ের উৎস বলতে অর্গানিক ফার্মিং, মেডিসিনাল প্ল্যান্ট, পোল্ট্রি, হ্যাচারি ইত্যাদি।

করে স্যাভলন স্প্রে করে দিলাম।

ফরেস্ট রেস্ট হাউসের উল্টোদিকে ডাইনিং রুম আর সংলগ্ন কিচেন। পাশেই একটি সুন্দর বসার জায়গা। আর ধনমায়া হোমস্টে। সেটিও বেশ সুন্দর সাজানো গোছানো। প্রচুর ফুল আর অর্কিডে সাজানো বাগান। ফ্রেশ হয়ে এককাপ গরম চা খেয়ে ব্যালকনিতে বসে গল্পগুজব করতে প্রকৃতির শোভা ও সন্ধ্যা নামা দেখলাম। সন্ধ্যায় গরম বেগুনি ও বাঁধাকপির পকৌড়াসহ আর এক রাউন্ড চা। বেশ ভালোই ঠান্ডা।

রাতে ডাল, আলুভর্তা, ফুলকপি ভাজা, পাঁপড়ভাজা ও দেশি মুরগির ঝোল। প্রসঙ্গত বলি মুরগি ছাড়া বাকি রেশন আমি নিয়ে গেছিলাম। ফরেস্ট রেস্টহাউসে গিয়ে গিয়ে আমার এ অভ্যেস হয়ে গেছে।

ভোরে উঠে অচিন্ত্য গেল পাখির সন্ধানে, বাকিরা ভিউ পয়েন্টে আর আমি পূর্ণ বিশ্রাম! ভোর সাড়ে পাঁচটায় অবশ্য দার্জিলিং ফার্স্ট ফ্লাশ পান করে দিলখুশ! আমি একটু চা-ভক্ত। একটু এগিয়ে ওই গেটের কাছ থেকেই পরে কাঞ্চনজঙ্ঘার দর্শনলাভ হল অবশ্য। একটু মেঘ জমেছে তখন। পোখরির দিকেও সামান্য হাঁটলাম। আমার পুত্র ও পারমিতারা ভিউ পয়েন্ট আপার চটকপুর পোখরি সব ঘুরে বেজায় খুশি এবং উত্তেজনায় ভরপুর। আর আমি করোনাকালের সাতমাসের পরিশ্রান্ত মনকে একদম ভারমুক্ত করে ফেললাম। পর্যটকদের আসা-যাওয়া-টুকরো কথা, পাশের হোমস্টের অতিথিদের খুশিমনে গান, পাইনবনের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া হাওয়ার শব্দ, পাহাড়চুড়োয় মেঘের আনাগোনা, ফ্লাই ক্যাচার আর শ্রাইকদের উড়ে বেড়ানো, অসংখ্য প্রজাপতি, আর স্টাফদের একটু বাড়তি যত্ন... এক কাপ কফি... এই তো আনন্দ জীবনের।

তারপর অচিন্ত্য ফিরে এলো আনন্দিত মনে। পাখিকে ক্যামেরায় বন্দী করেছে। ও ব্রেকফাস্ট সেরে দার্জিলিং চলে গেল আর আমরাও তাড়াতাড়ি লাঞ্চ সেরে ফিরবার পথ ধরলাম। লাঞ্চে ফ্রায়েড রাইস আর ডিমের কারি।

সব মিলিয়ে চটকপুর চমৎকার...!

নোট ঃ ছবিগুলির কয়েকটি সুদীপ্ত রায়ের তোলা। গাড়ি ভাড়া এনজেপি থেকে হাজার তিনেক টাকা, দার্জিলিং থেকে হাজার দেড়েক টাকা। হোম স্টে তে মাথাপিছু থাকা খাওয়া বাবদ ১২০০-১৪০০ টাকা। বুকিং এর জন্য বিনোদ রাইকে ফোন করুন ৭৫৮৩৯৭১৫১৭।

বিশেষ নিবন্ধ

প্রাচীন শিলা- প্রস্তর-তাম্রলিপিতে উত্তরবঙ্গের সন্ধান

ড. ইন্দ্রানী রায়

বাংলার প্রাচীন জনপদগুলির ইতিহাস আমরা পুরাতাত্ত্বিক উপাদানের অন্তর্গত অভিলেখমালা যথা শিলালিপি, প্রস্তরলিপি, তাম্রলিপিগুলির বিধৃত তথ্য থেকে জানতে পারি। অবিভক্ত বাংলার প্রাচীন জনপদগুলির মধ্যে রয়েছে গৌড়, পুন্ড্রদেশ বা পুন্ড্রনগর, বরেন্দ্র, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত ইত্যাদি।

এখনকার বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত মৌর্যযুগের একটি ক্ষুদ্র মহাস্থান-শিলালিপিতে 'পুন্ড্রনগর' নামে বাংলার প্রথম নগরের উল্লেখ পাই— ...'সুলখিতে পুডনগলতে', ...এই শিলালিপিটি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে, প্রাকৃতভাষায় ও ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা। এই পুন্ড্রনগরই পরবর্তীকালে পুন্ড্রবর্দ্ধন বা পুন্ড্রবর্ধনভুক্তি এবং এই পুন্ড্রবর্ধনভুক্তিই উত্তরবাংলা তথা উত্তরবঙ্গের আদি নাম। প্রাচীন পুন্ড্রজাতি উত্তরবাংলায় বাস করত, বগুড়া জেলায় করতোয়া নদীর তীরবর্তী মহাস্থানগড়ই এই প্রাচীন নগর।

'পুন্ড্র' শব্দটি জাতি ও দেশ দুটিরই নাম হিসাবে পাওয়া যায়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে পুন্ড্রজাতির বসবাসের কারণেই স্থানটির নাম পুন্ড্রনগর বা পুন্ড্রবর্ধন, সেই হিসাবে উত্তরবাংলার আদি জনগোষ্ঠী বা জনজাতির নাম পুন্ড্র। Pargiter বলেছেন পুন্ড্ররা পুন্ড্রনগরে বাস করতেন, যেটি মহাস্থানগড়ে অবস্থিত। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্যযুগে পুন্ড্রবর্ধন একটি জৈনকেন্দ্র ছিল।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্তযুগে উত্তরবাংলায় প্রাপ্ত গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকালের পাঁচটি দামোদরপুর তাম্রশাসন বা তাম্রলিপি প্রথম উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক তথ্য সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করে। বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার দামোদরপুর গ্রামে পাওয়া পাঁচটি তাম্রশাসন বা তাম্প্রলিপিই প্রমাণ করে যে প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকাল থেকে প্রায় এক শতাব্দীব্যাপী সময় (৪৪৩-৫৩৪ খ্রিস্টাব্দ) উত্তরবাংলা পুন্ড্রবর্ধনভুক্তি নামে গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে ছিল। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য গুপ্ত সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করা হয়েছিল। পূর্ব ভারতের এই প্রাদেশিক কেন্দ্রটির নাম পুন্ড্রবর্ধনভুক্তি যা পরবর্তীকালে উত্তরবাংলা নামে পরিচিতি লাভ করে। ৪৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম কুমারগুপ্তের সময়ে দামোদরপুর তাম্রশাসনে এবং ৪৪৭ খ্রিস্টাব্দে কুমারগুপ্তের দ্বিতীয় দামোদরপুর তাম্রশাসনে আমরা পাই—'পরমদৈবত—পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীকুমার গুপ্তে পৃথিবীপতৌ তৎপাদ-পরিগৃহীতে পুন্ড্রবর্দ্ধনভুক্তাদুপরিক—চিরাতদত্তেন...'। সংস্কৃতভাষায় ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা এই দুটি তাম্রলিপিতে দেখা যায়, তখন প্রথম কুমারগুপ্ত পৃথিবীপতি ছিলেন এবং পুন্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিতে উপরিক অর্থাৎ উচ্চশ্রেণির প্রদেশ শাসক বা রাজকর্মচারী ছিলেন সম্রাটের পাদপরিগৃহীত চিরাতদত্ত। ৪৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত দামোদরপুর তাম্রশাসনে দেখতে পাই, তখন পৃথিবীপতি ছিলেন সম্রাট বুধগুপ্ত আর পুন্ড্রবর্ধনভুক্তির ভুক্তি উপরিক বা প্রদেশকর্তা ছিলেন বুধগুপ্তের পাদপরিগৃহীত মহারাজ ব্রহ্মদত্ত... 'মহারাজাধিরাজ শ্রীবুধগুপ্তে পৃথিবীপতৌ তৎপাদপরিগৃহীতে পুন্ড্রবর্দ্ধনভুক্তাবুপরিক মহারাজ ব্রহ্মদত্তেন'...। এইভাবে বগুড়া জেলায় প্রাপ্ত গুপ্তযুগের পাঁচটি দামোদরপুর তাম্রশাসনেই আমরা পুন্ড্রবর্ধনভুক্তির নাম পাই যা অবিভক্ত বাংলায় উত্তরবাংলা ও পরে তা উত্তরবঙ্গ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

গুপ্তযুগের পাহাড়পুর তাম্রলিপিতেও (৪৭৯ খ্রি.) পুন্ড্রবর্দ্ধনের নিকটবর্তী অঞ্চলে জৈন বিহারের উল্লেখ আছে... পুন্ড্রবর্ধনাদযুক্তকা আর্যনগরশ্রেষ্ঠী।

মেহার তাম্রলিপিতে সমতট দেশকে পুন্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাঁচীর অভিলেখেও আমরা এই ভুক্তিটির নাম পাই। কলাইকুড়ি সুলতানপুর তাম্রলিপিতে দেখি—'পূণ্যাভিবর্দ্ধয়ে পৌন্ড্রবর্দ্ধনক'।

প্রাচীন গ্রিক, চৈত্রিক, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে পুন্ড্রদেশের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। পুন্ড্রজাতি শুধু বাংলার নয়, পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতি বলে গণ্য করা হয়। ইজিপ্ট ও ব্যবিলনীয়ান সভ্যতার সমসাময়িক এই পুন্ড্রসভ্যতা পূর্বভারতের খুব গুরুত্বপূর্ণ এক সভ্যতার সাক্ষী। ১৮০৮ সালে আলেকজান্ডার কানিংহাম প্রথম এই পুন্ড্রদেশ ও পুন্ড্রসভ্যতা বিষয়ে আলোকপাত করেন। এই পুন্ড্রসভ্যতা সম্পূর্ণ পুন্ড্র-রাঢ় বঙ্গ বিস্তৃত ছিল, এর অন্তর্গত কোটিবর্ষ প্রদেশ খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল, যেটি পরে দক্ষিণ দিনাজপুরের বাণগড় নামে পরিচিত হয়।

চীন দেশের বৌদ্ধপরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ্ এর ভ্রমণবৃত্তান্ত 'সি-য়ু-কি' তে বাংলার চারটি জনপদের বর্ণনা আছে, তারমধ্যে পুন্ড্রবর্দ্ধন অন্যতম, অন্যান্য তিনটি জনপদ হল কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্ত। ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ্ ভাগলপুরের চম্পা থেকে ৪০০ লি-র কিছুটা বেশি পূর্বে রাজমহলের কাছে কজঙ্গলে পৌঁছান। কানিংহামের হিসাব অনুযায়ী এক লি প্রায় ছয় মাইলের সমান। কজঙ্গল থেকে গঙ্গা পার হয়ে ৬০০ লি-র (১০০ মাইলের) কিছু বেশি পূর্ব দিকে পরিব্রাজক পুন্ড্রবর্ধনদেশে উপস্থিতি হন। পুন্ড্রদেশের পরিধি ছিল ৪০০০ লি-র উপর। দেশের জনগণের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল, সর্বত্র পুকুর, সরাইখানা ও উদ্যান দেখা যেত। মাটি নরম ছিল, প্রচুর শস্য জন্মাত। কাঁঠাল খুব বেশি জন্মাত এবং স্থানীয় লোকের খুব প্রিয় ছিল। দেশের আবহাওয়া বেশ ভাল, এবং

অধিবাসীরা বিদ্যার উপর শ্রদ্ধাশীল ছিল। এই দেশে কুড়িটি বৌদ্ধবিহারে হীনযান ও মহাযান মতাবলম্বী অনেক বৌদ্ধভিক্ষু বাস করতেন। দেশে প্রায় একশত দেবমন্দির ছিল বলে পরিব্রাজক জানিয়েছেন।

সপ্তম শতকে হিউ-এন-সাঙ্ যে বৃহৎ নদী পার হয়ে পুন্ড্রবর্ধন থেকে কামরূপদেশ বা আসামে গিয়েছিলেন, 'তাঙ্-শু' নামক চীনা গ্রন্থানুসারে সেই নদীটির নাম Ka-lo-Tu অর্থাৎ করতোয়া। 'তাঙ্-শু' তে দেখি কামরূপের দক্ষিণ-পশ্চিমে ১২০০ লি দূরে পুন্ড্রবর্দ্ধন। করতোয়া নদী কামরূপ ও পুন্ড্রবর্দ্ধনকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। সন্ধ্যাকরনন্দী রচিত 'রামচরিত' গ্রন্থে করতোয়া নদীকে বরেন্দ্রীর সীমা অর্থাৎ পূর্বসীমা বলা হয়েছে। কখনও কখনও বরেন্দ্রকে পুন্ড্রের অন্তর্গত জনপদ বলা হয়েছে। রামচরিত কাব্যের কবি সন্ধ্যাকর নন্দী পৌন্ড্রবর্দ্ধনপুর সন্নিহিত একটি স্থানের করণ বা কায়স্থ বংশীয় অধিবাসী ছিলেন। এই গ্রন্থে গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যে যে রামাবতীনগর স্থাপনের কথা বলা আছে। ড. দিনেশচন্দ্র সরকারের মতে এই 'রামাবতী' আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'র রামৌতী।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুন্ড্রজাতিকে পূর্ব ভারতের একটি জাতি বা জনগোষ্ঠী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাণগুলিতে পুন্ড্রজাতি ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশে বাস করত এরূপ বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবিভক্ত বাংলার উত্তরাংশ বা উত্তরবঙ্গ ছিল পুন্ড্রজাতির বাসস্থান যা বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় বলে পরিচিত।

ভবিষ্যপুরাণের একটি কিংবদন্তীতে পুন্ড্রদেশের অন্তর্গত সাতটি দেশের নাম বলা হয়েছে— যথা গৌড়, বরেন্দ্র, সুক্ষ্ম, জাঙ্গল, ঝাড়িখন্ড ও বর্ধমান।

'দিব্যাবদান' এ অশোকের রাজত্বকালে পুন্ড্রবর্দ্ধনের নাম পাই। 'দিব্যাবদান' অনুসারে বিহারের পূর্বপ্রান্তস্থ রাজমহলের নিকট কজঙ্গল থেকে পূর্বদিকে পুন্ড্রবর্দ্ধন অবস্থিত ছিল।

জৈন 'কল্পসূত্র'-এ দেখা যায় মৌর্য যুগে ভদ্রবাথুর শিষ্য গোদাম যে গোদামীয়-গণ স্থাপন করেছিলেন, পরবর্তীকালে তার চারটি শাখা গড়ে ওঠে এবং তার মধ্যে তিনটির নাম ছিল পুন্ড্রবর্ধনীয়, তাম্রলিপ্তিক ও কোটিবর্ষীয়।

পাল সাম্রাজ্যের অবনতির যুগে দ্বাদশ শতকে ভাগীরথীর পশ্চিমাঞ্চল বাদে বাংলার মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ অংশকে পুন্ড্র অর্থাৎ পৌন্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত বলা হয়েছে। 'ভুক্তি' শব্দটি প্রদেশ বা রাজ্যের সর্ববৃহৎ বিভাগ অর্থে ব্যবহৃত হত, সেই অর্থে পৌন্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি তথা উত্তরবাংলা সর্ববৃহৎ প্রদেশ বা বিভাগ বলে পরিগণিত হত।

হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বলেছেন যে মূলত উত্ত

প্রাচীন গ্রিক, চৈত্রিক, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে পুন্ড্রদেশের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। পুন্ড্রজাতি শুধু বাংলার নয়, পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতি বলে গণ্য করা হয়। ইজিপ্ট ও ব্যাবিলনীয়ান সভ্যতার সমসাময়িক এই পুন্ড্রসভ্যতা পূর্বভারতের খুব গুরুত্বপূর্ণ এক সভ্যতার সাক্ষী।

রবাংলাবোধক এই ভুক্তিটি বুধগুপ্তের সময়ের তাম্রশাসন প্রভৃতি অনুসারে উত্তরে হিমালয় পর্বতের শিখরবিশেষ থেকে দক্ষিণে সুন্দরবনের খাড়ি অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এই বিষয়ে মতভেদ আছে।

মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মৌর্যযুগ থেকে দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দে সেনদের রাজত্বকাল পর্যন্ত পুন্ড্রদেশ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র বলে পরিগণিত ছিল যা সপ্তম শতকে হিউ-এন-সাঙ্ এর ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকেও আমরা নিশ্চিত হই।

সূত্র ঃ Select Inscription, Vol. I, Dr. Dinesh Chandra Sircar; Corpus of Bengal Inscriptions, Sri Ramaranjan Mukherjee and Sachindra Kumar Maity; পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত, ড. দীনেশচন্দ্র সরকার

ছাঁচের বাইরে বামপন্থা সর্বকালেই আত্মহন্তা

গৌতম রায়

বামফ্রন্ট গঠিত হওয়ার পর ১৯৭৭ সালে যখন তাঁরা ক্ষমতায় আসেন সেই সময়ে তাঁদের দলের নেতৃত্বের একটি বড় অংশ ধ্রুপদী মার্কসীয় চিন্তাতেই বেশি মগ্ন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ'-এর "চলো নিয়ম মতে, চলো আপন পথে" ছিল তাঁদের বিচরণ। এই বিচরণ ধারাতে ডঃ অশোক মিত্রের মত মানুষেরা একভাবে পরিক্রমা করেছিলেন, আবার জ্যোতি বসু আর এক ভাবে পথ চলেছিলেন। অশোক মিত্রের বিচরণ ধারাতেই কিন্তু সম্ভব হয়েছিল 'রমলা' খ্যাত মণীন্দ্রলাল বসুকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তখন তথ্য-সংস্কৃতি মন্ত্রী হলেও এইসব নন-মার্কসিস্ট কবি, সাহিত্যিকদের প্রতি কতটা উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতেন, তা ঘিরে বিতর্ক আছে।

জনগণেশের তুষ্টি ঘিরে ডঃ মিত্রের সঙ্গে জ্যোতি বাবুর সংঘাত, ডঃ মিত্রের পদত্যাগ। ধ্রুপদীয়ানার মার্কসবাদ যে দেশকালের সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়— এই কথাটা বলার ও বোঝাবার মত মানুষদের আড়ালে চলে যাওয়ার সেই বোধহয় সূচনা। একটা উভয় সঙ্কটের কাল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'সেই সময়' উপন্যাসের জন্যে যখন বঙ্কিম পুরস্কার পাচ্ছেন, বুদ্ধবাবু তখন আর মন্ত্রী নন। '৮২-র ভোটে কাশীপুর থেকে তিনি হেরে গিয়েছেন। তিনি হেরেছিলেন, না কি তাঁকে হারানো

হয়েছিল— এ নিয়ে কাশীপুরের পুরনো ভোটারদের ভিতরে একটা বড় প্রশ্ন আছে। বুদ্ধবাবুর সেদিনের পরাজয়ের পিছনে হোসিয়ারি আন্দোলনের নেতা রবি পোদ্দারের কোনও ভূমিকা ছিল কি না— এটা অনেকেরই জিজ্ঞাসা। সেই জিজ্ঞাসু মানুষজনেরাই প্রশ্ন তোলে, রবি পোদ্দার যার দ্বারা পরিচালিত হতেন, পরবর্তীকালের সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা তথা মন্ত্রী মহোদয় সম্পর্কেও।

পুঁথিগত বামপন্থা তখন আমাদের হাড়ে মজ্জায় ঢুকে গিয়েছিল। গন্ডির বাইরে গেলে ভীষণ বিপদ— ব্যঙ্গের ছলে রবীন্দ্রনাথের কথাগুলিই যেন হয়ে গিয়েছিল আমাদের জপমন্ত্র। কীসের গন্ডি? না, নেতা যেটাকে চরম সীমানা বলে মনে করছেন, সেটাই হল সীমারেখা। আজ যেটাকে দুর্লঙ্ঘনীয় মনে করছেন নেতা, কালই সেটাকে নতুন নেতা আর ঘেরাটোপ বলে মনে করছেন না। তাই একদিন যেটাকে অতিক্রম করা যাবে না বলে নিদান দিয়েছিলেন নেতা, সেই নিদানের পিছনে কতটা দেশের স্বার্থ, দলের স্বার্থ কাজ করেছিল আর কতখানি নেতার আপন সাম্রাজ্য বজায় রাখবার তাগিদ কাজ করেছিল— সেটা ভাববার মত সময় কোথায় ছিল? নেতার কথা শুনলে আমার চাকরি হবে। ব্যবসায় উন্নতি হবে। বৌ-ছেলে-মেয়ে বেঁচে বর্তে থাকব। নেতা চাইলে আমি সমাজে কেউকেটা হয়ে যাব। আবার আমার যতই পারদর্শিতা থাকুক না কেন, নেতা চাইলে আমার নাট্যকার নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তের মত দশাও হয়ে যেতে পারে।

একটু 'আমি আমি' হয়ে গেলেও নিজের ছাত্রজীবনের শেষপ্রান্তের একটা কথা না বলে পারছি না। '৮৯-এর লোকসভার ভোটে জাতীয় রাজনীতিতে একটা বড় পটপরিবর্তন ঘটেছে। যাদবপুরে স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হেরে গিয়েছেন মালিনী ভট্টাচার্যের কাছে। তার আগে রাজীব গান্ধীর সরকার যে জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া দিয়েছিলেন, '৮৯-এর ভোটে সেটিও ছিল একটি ইস্যু। একটা আলোচনা সভার আয়োজন করা হল একটি মফস্বল শহরে। আয়োজক স্থানীয় কিছু কিশোর ছাত্রদের সদ্য সৃষ্ট সংগঠন 'তার্কিক'। ইস্কুল কলেজের ছাত্রেরা দুরুদুরু বক্ষে আমন্ত্রণ জানালেন সাংসদ মালিনী ভট্টাচার্যকে। সেইসঙ্গে বর্ষীয়ান মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরীকে। দুজনেই সানুনয় সম্মতি দিলেন।

কিন্তু দলেই কোথাও প্রশ্ন উঠল, কেন দলের বাইরের কিছু ছেলেদের একটি সংগঠনে পার্টির এইসব তারকারা আসবেন? শিল্পাঞ্চলের এক শ্রমিক নেতা, যিনি ছড়ি ঘোরান গোটা শিল্পাঞ্চলেই, তিনি ক্ষেপে গেলেন। উদাহরণ দিলেন, আগেও দয়াল নামক এক কর্মী এইভাবে নাকি 'ইন্ডিভিজুয়ালিজম' চালাতেন। তাই তিনি করতে দেবেন না এই সভা। চরম বাগড়া দিতে শুরু করলেন। সমস্ত বাগড়া

> **পুঁথিগত বামপন্থা তখন আমাদের হাড়ে মজ্জায় ঢুকে গিয়েছিল। গন্ডির বাইরে গেলে ভীষণ বিপদ— ব্যঙ্গের ছলে রবীন্দ্রনাথের কথাগুলিই যেন হয়ে গিয়েছিল আমাদের জপমন্ত্র। কীসের গন্ডি? না, নেতা যেটাকে চরম সীমানা বলে মনে করছেন, সেটাই হল সীমারেখা। আজ যেটাকে দুর্লঙ্ঘনীয় মনে করছেন নেতা, কালই সেটাকে নতুন নেতা আর ঘেরাটোপ বলে মনে করছেন না।**

উপেক্ষা করে মালিনী ভট্টাচার্য কিন্তু এলেন, বললেন। বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, যাঁকে বামপন্থার পরাকাষ্ঠা ধরা হয়, তিনি এলেন না। ছাত্রেরা বারবার তাঁকে ফোন করা সত্ত্বেও ফোনটা পর্যন্ত ধরলেন না। হয়ত সেই শ্রমিক নেতা, যিনি তাঁর ব্যক্তি ভাবনাকে পার্টির ভাবনা বলে যে চাপিয়ে দিয়েছেন, তাঁর কথা ভেবেই সেই গোলমালে থাকতে চাইলেন না বিনয়বাবু। হয়ত

মালিনী ভট্টাচার্যকেও নানা ভাবে না আসার কথা এই পার্টিজানেরা বলে থাকবেন। তবে শিক্ষিকা মালিনীর কাছে ইস্কুল কলেজে পড়া ছাত্রেরা এইসব যন্তরমন্তর ঘরে মস্তিষ্ক প্রক্ষালনোত্তর পার্টি নেতাদের থেকে অনেক বেশি আপনার মনে হয়েছিল হয়ত, তাই তিনি তাঁর কথার খেলাপ করলেন না। আজ যখন দশ বছর বামপন্থীরা ক্ষমতার বাইরে তখন সেই শ্রমিক নেতার আত্মীয় পরিজন এখন কতটা বামপন্থী রাজনীতিতে সক্রিয় তা তাঁদের দলের সহযোদ্ধারা ঠিক নিশ্চিত হয়ে না বলতে পারলেও, বা সেই 'তার্কিক' গ্রুপের কোনও কোনও কর্মী নতুন শাসকদের ভক্ত হলেও কর্মকর্তাটি কিন্তু শত জল-ঝড়-বৃষ্টিতেও তাঁর আস্থার জায়গাটি বদলান নি। যেমন বদলান নি 'দয়াল' নামক সেই ভদ্রলোকটিও।

মালিনী ভট্টাচার্যের নতুন প্রজন্মের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষার যে অঙ্গীকার ছিল, সেই অঙ্গীকার রাখার প্রয়োজন বোধ করেন নি বিনয় চৌধুরী। তাঁর সততা ঘিরে কিংবদন্তীতুল্য কাহিনি আজও শোনা যায়। কিন্তু দলে আধিপত্য বিস্তারের দৌলতে যিনি 'নেতা' হয়েছেন, তাঁকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে একদম ঘেরাটোপের বাইরে অথচ কমিউনিষ্ট হতে আত্মপ্রত্যয়ী কিশোরদের মনে ও কৈশোরিক অনুভূতিতে যে ট্রমা তৈরি করেছিলেন সেদিন বিনয় চৌধুরী, আজ গোঁড়ামি থেকে বের হয়ে আসা কমিউনিষ্ট পার্টির অবস্থান দেখে, সেদিন কোনটা ঠিক ছিল, মালিনী ভট্টাচার্যের অবস্থান, না বিনয় চৌধুরীর, তা বিচারের ভার পাঠকের হাতেই না হয় ছেড়ে দেওয়া গেল।

(২)

যুক্তফ্রন্ট সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতায় বামপন্থীরা '৭৭ সালে ক্ষমতায় এসে কখনই ভাবেন নি পাঁচ বছর তাঁরা শাসন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবেন। এই ধারণা তাঁদের আরও প্রবল হয় '৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী ফিরে আসার পর। তাই প্রথম বামফ্রন্ট মানুষকে রিলিফ দেওয়ার কাজটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিল। সেই সঙ্গে ভূমি সংস্কার। ভূমি সংস্কারের ভাবনা বামফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে ছিল। সেই ভাবনার বাস্তবায়নের দিকটি বামফ্রন্ট সরকার করতে শুরু করে '৭৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর। ততদিনে কিন্তু সিপিআই(এম) শীর্ষ নেতৃত্ব বুঝেছেন যে, সরকার গঠন কালে দপ্তর বন্টনের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত দপ্তরটি শরিক দল আরএসপিকে দিয়ে তাঁরা বিরাট রকম ভুল করেছেন। এই বিষয়টি প্রথম প্রমোদ দাশগুপ্তকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের মাত্র এক টাকা বেতনের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সত্যব্রত সেন। সত্যব্রতবাবু এই বিষয়টি নিয়ে শারদ 'দেশহিতৈষী'তে একটি প্রবন্ধ লেখেন। '৮২ সালে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার তৈরির সময়ে প্রমোদবাবু দপ্তরটি নিজেদের দলের হাতেই রেখে দেন।

শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিগত ভাবে যারা বামপন্থীদের একদম ভিন্ন শিবিরের মানুষ ছিল, সেইসব লোকেরা '৭৮ এর পঞ্চায়েত ভোটের পর একদম ব্যক্তিগত স্বার্থে শিবির বদল করতে শুরু করে দিল। এই বিষয়ে একটা উদাহরণের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। সাম্প্রতিক রাজনীতিতে বহুল আলোচিত নন্দীগ্রামে '৬৪ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির ভাঙনের পর সেখানে সিপিআই(এম)-এর একটি ইউনিট পর্যন্ত ছিল না। চারজন মাত্র ছিলেন সিপিআই(এম) সদস্য। পুরো কমিউনিষ্ট পার্টিটা ছিল সিপিআই-এর সঙ্গে। নন্দীগ্রামে রাজনৈতিক দল হিসেবে সিপিআই(এম)-এর ব্যাপ্তি '৭৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর।

যে সামন্ততান্ত্রিক পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে বামপন্থীরা চিরদিন লড়াই করেছেন, সেই পরিকাঠামোই বামফ্রন্টের জনগণতান্ত্রিক লড়াইয়ে নিজেদেরকে মিশিয়ে দিয়েছিল নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করবার কৌশল হিশেবে। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'সঙ্গ নিসঙ্গ' উপন্যাসে এই সঙ্কটের আবর্তের সামাজিক ইতিহাসটা ধরা আছে। সাবেক লড়াকু বামপন্থীদের থেকে এই ভোলবদল করা আধা সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধিরাই তখন ধীরে ধীরে বামপন্থীদের ভিতরে বিশেষ ক্ষমতাবান হয়ে উঠতে শুরু করে। চাপা পড়ে যেতে থাকেন সাবেক লড়াকু বামপন্থীরা। কৃষক সমাজের থেকে বামপন্থীদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার সেই শুরু। বামফ্রন্ট সরকার যত দীর্ঘস্থায়ী হয়ে হয়েছে, বামপন্থীরা ততই তাঁদের শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনতার প্রতিনিধিত্বের

শ্রেণী চরিত্র হারিয়ে মধ্যবিত্ত মানুষদের প্রতিনিধি হয়ে উঠতে শুরু করেছে। মধ্যবিত্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ক্রমশ গিলে খেতে শুরু করেছে বামপন্থী আন্দোলনের সার্বিক চরিত্রকে।

শহুরে মধ্যবিত্তদের দ্বারা বামফ্রন্ট ভুক্ত বামপন্থী দলগুলি ক্রমশ পরিচালিত হওয়ার ফলে বামপন্থী আন্দোলনের মূল স্তম্ভ যে খেটেখাওয়া মানুষ তাঁদের স্বার্থের প্রতি বামফ্রন্ট সরকার নীতিগত ভাবে সম্পূর্ণ সজাগ থাকলেও প্রশাসন এবং দলের নীচুতলার ভিতরে সেটির প্রয়োগের বিষয়ে তৈরি হল প্রচন্ড রকমের শৈথিল্য। একটা সময়ে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা ও পঞ্চায়েত) বিকেন্দ্রীকরণ হয়ে উঠল দলের লোক নয়, দলের ক্ষমতাসীন নেতাদের নিজেদের লোকদের চাকরি থেকে শুরু করে কনট্রাকটারি— সবকিছুর স্বর্গক্ষেত্র। দলের সত্যিকারের দুর্দিনের যারা কর্মী, তার একটা বড় অংশ বঞ্চিত হল। কিন্তু দল ক্ষমতায় থাকার দৌলতে যারা দল করতে এসেছে, সেই অংশটাই ক্রমশ ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকল।

প্রমোদ দাশগুপ্তের মৃত্যুর পর সুভাষ চক্রবর্তী রাতারাতি শিবির বদল করে হয়ে উঠলেন জ্যোতি বসুর লোক। এই সুভাষ চক্রবর্তীকেই একদিন বলা হত, ‘প্রমোদ দাশগুপ্তের ঢাল’। অবিভক্ত চব্বিশ পরগণাতে সিপিআই(এম)-এর জেলা সম্মেলনে গোপাল বসু যখন প্রমোদবাবুকে দোয়াত ছুঁড়ে মারতে গিয়েছিলেন, তখন প্রমোদবাবুকে বাঁচাতে সবার আগে উদ্যোগী হয়েছিলেন এই সুভাষ চক্রবর্তী। সেই সুভাষবাবুই যে ভাবে নিজের কার্যক্রম এবং রাজ্য সরকারের একটা পর্যায়কে পরিচালিত করেছিলেন তা কোনও অবস্থাতেই কমিউনিষ্ট পার্টিজনোচিত বলা যায় না। হোপ ’৮৬ থেকে যেসব পর্ব সুভাষ চক্রবর্তীর দ্বারা সংগঠিত হয়েছে তা বামপন্থা এবং বামপন্থীদের রাজনৈতিক চরিত্রের সঙ্গে যায় না। সুভাষবাবুর এই ধরণের কাজগুলি নিশ্চয়ই তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর অপছন্দের ছিল না। কারণ, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এক মুহূর্তের জন্যেও হোপ ’৮৬ এর মত অনুষ্ঠানে না গেলেও জ্যোতি বসু গিয়েছিলেন, দীর্ঘসময় ছিলেন। যে মিঠুন চক্রবর্তীকে তখন সুভাষবাবু সাংস্কৃতিক আইকন করে তুলেছিলেন, সেই মিঠুন পরবর্তীতে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন অনেকদিন। চিটফান্ড পর্বে তাঁর নাম আলোচিত হতে থাকলে তিনি রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা দেন। এখন বিজেপির সঙ্গে আছেন সেই মিঠুন।

(৩)

মান নয় সংখ্যা— এটির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া বোধহয় বিশ্বের সব কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির সঙ্কটের একটি কারণ। পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই(এম) কখনোই তার থেকে ব্যতিক্রম নয়। বামফ্রন্ট সরকারের

বামফ্রন্ট সরকারের ধারাবাহিকতার ভিতরে একটা সময়ে সিপিআই(এম) তাঁদের দলের ভিত্তি আরও সবল করতে কোনওরকম বাছবিচার না করে যে সদস্যপদ বিলি করেছে, সেটি ২০১১-র নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর তাঁদের দলের সাংগঠনিক ভিত্তি বালির বাঁধের মত ভেঙে পড়বার একটি অন্যতম বড় কারণ।

ধারাবাহিকতার ভিতরে একটা সময়ে সিপিআই(এম) তাঁদের দলের ভিত্তি আরও সবল করতে কোনওরকম বাছবিচার না করে যে সদস্যপদ বিলি করেছে, সেটি ২০১১-র নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর তাঁদের দলের সাংগঠনিক ভিত্তি বালির বাঁধের মত ভেঙে পড়বার একটি অন্যতম বড় কারণ। সাংগঠনিক স্তরে, বিশেষ করে ভূমিস্তরে যে ব্যক্তি নেতৃত্বের হয়ে বেশি জোরে দলীয় সাংগঠনিক বৈঠকে হাত তুলতে পারবে, সেই ব্যক্তির তত দ্রুত দলীয় সদস্যপদ মিলেছে। কেবল তাই নয়, চড়চড় করে নেতৃত্বের পদে সে অভিষিক্ত হয়েছে।

কিন্তু সেই লোকটির ভিতর শ্রেণী চেতনা তো দূরের কথা, রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের চেষ্টাটুকু হয় নি।

তার পাশাপাশি বলতে হয়, এমন কিছু কিছু মানুষকে অপরীক্ষিত ভাবেই প্রশাসনের উচ্চস্তরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যেটা কোনও অবস্থাতেই সিপিআই(এম) বা বামফ্রন্টের মতাদর্শগত দিক থেকে ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করা যায় না। ডঃ অশোক মিত্রের অর্থমন্ত্রী হিসেবে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার পর ডঃ অসীম দাশগুপ্তের মত রাজনীতির বাইরের একজন মানুষকে প্রশাসনের উঁচু জায়গায় বসানো হয়েছিল, যে মানুষটি চেতনাগতভাবে বামফ্রন্ট সরকারের ভাবাদর্শের সঙ্গে কতটা সাযুজ্যপূর্ণ— অভিজ্ঞ বামপন্থীদের ভিতরে আজও সেই প্রশ্ন থেকে গেছে। এই ভাবে রাজনীতির পরিমণ্ডলের বাইরের কোনও উচ্চ শিক্ষিত মানুষকে ধরে এনে মন্ত্রী করে দেওয়া— এটা বুর্জোয়া রাজনীতির সংস্কৃতির সঙ্গে খুবই সঙ্গতি সম্পন্ন। তা বলে এই সংস্কৃতি কি বামপন্থীদের সঙ্গে যায়? জেলা স্তরে রাজনীতি করেন, এমন বহু বামপন্থী নেতা জেলায় গিয়ে অসীমবাবুর সারবত্তাহীন প্রতিশ্রুতি ঘিরে পরবর্তী সময়ে তাঁদের রাজনীতি ক্ষেত্রে কী ধরণের কঠিন সঙ্কটে পড়তে হচ্ছে সে নিয়ে সরব হয়েছেন, দলীয় স্তরে এমনটাই শোনা যায়। কিন্তু বহু ধরণের অদলবদল সত্ত্বেও অসীম দাশগুপ্তের প্রতি অন্তহীন আস্থার ক্ষেত্রে জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং তাঁদের দলীয় নেতারা কখনও বিমুখ হন নি।

আজ এক কঠিন সত্য মন না চাইলেও মানতেই হবে যে বুদ্ধবাবু তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের দশ বছরে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে যতখানি রাজনৈতিক বিরোধিতা পেয়েছিলেন, তার থেকে কম বিরুদ্ধতা পান নি তাঁর নিজের দলেরই একাংশের কাছ থেকে।

সুভাষ চক্রবর্তী, লক্ষণ শেঠ, তড়িৎ তোপদার, শ্যামল চক্রবর্তী, গৌতম দেব প্রমুখদের নিজস্ব ভাবনার বামপন্থা পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার এবং ফ্রন্ট ভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে উঁই পোকার মত খেতে শুরু করেছিল। একটা সময়ে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যে মতাদর্শগত লড়াই হয়, যার জন্যে কমিউনিষ্ট পার্টি ভেঙে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী) তৈরি হয়, সেই সময়কালে শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বে বিশ্বাসীদের শায়েস্তা করতে নন্দগোপাল ভট্টাচার্য খুবই সক্রিয় ছিলেন। ভাতিন্দা কংগ্রেস উত্তরকালে সিপিআই যখন বামফ্রন্টের অন্তর্গত হয় তারপর থেকে বেশ কয়েকবার শিয়ালদহ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নন্দবাবু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ও হেরে যান। এরপর দলের সম্পাদক থাকেন বেশ কিছুকাল। তারপর দলের সম্পাদকের পদের থেকে মন্ত্রী হওয়াটাই হয়ে ওঠে নন্দবাবুর কাছে মুখ্য বিষয়। তাই দাঁতন থেকে লড়েন। জেতেন। মন্ত্রী হন। বামফ্রন্টগত কারণেই জ্যোতি বসু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উপায় ছিল না নন্দবাবুকে মন্ত্রী না করার। জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রিত্বের কালে মন্ত্রীসভার ভিতরে সুভাষ চক্রবর্তী, শ্যামল চক্রবর্তী, গৌতম দেবরা কোনও সুপার ক্যাবিনেট চালাতেন কি না, এ নিয়েও যেমন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ভিতরে অনেক ভাবনা চিন্তা আছে, আবার সিপিআইয়ের নন্দবাবু ও আরএসপির ক্ষিতি গোস্বামীরা বুদ্ধবাবুর উপর চাপের রাজনীতি চালিয়ে যেতে সেই সুপার ক্যাবিনেটে নাম লিখিয়েছিলেন কি না— এ নিয়েও বিতর্ক কম নেই।

বুদ্ধবাবু তখনও ক্ষমতার শীর্ষ বিন্দুতে আসেন নি, নয়ের দশকের গোড়ার দিক, সাট্টা ডন রশিদ খান পর্ব নড়িয়ে দিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারের নৈতিক ভিত্তি। সিপিআই(এম)-এর নীচু তলার কর্মী, সমর্থকদের ঘিরে যে অভিযোগ ওঠে, সেই অভিযোগ সেদিন উঠেছিল উঁচুতলাকে ঘিরে। তৈরি হয়েছিল রবীন সেনের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি। তদন্ত শেষ। পরের

দিনই প্রতিবেদন জমা দেবেন রবীন সেন নেতৃত্বের কাছে, রাতেই নাকি কচ্ছপের মাংস খাওয়ার ফলে তিনি ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। তাঁর সেই তদন্তের প্রতিবেদনটিও যথারীতি হাওয়া। অনেকেরই অনুমান, ওই রিপোর্টটি যদি জমা পড়ত তাহলে পরবর্তীতে যাঁরা সরকার এবং দলে ছড়ি ঘুরিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই রবীন সেন কমিটির তদন্ত রিপোর্ট মোতাবেক দলেই থাকতে পারতেন না।

বুদ্ধবাবু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরই নতুন করে তাঁর উপর প্রেসার ট্যাকটিকস হিশেবে সুভাষ চক্রবর্তীর দল ছাড়ার গুজব বাজারে ছড়ানো হল। যে আদর্শগত কারণে সৈফুদ্দিন চৌধুরীর সঙ্গে সিপিআই (এম)-এর দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, তার ধারপাশ দিয়ে যায় নি সুভাষবাবুর এই 'দল ছাড়ব, দল ছাড়ব' চাপের খেলাটি। জ্যোতি বসু না থাকার ফলে প্রশাসন আর দলে সুভাষ বা তাঁর ঘনিষ্ঠদের যা খুশি করাটা আর সম্ভব হয়ে উঠছিল না। তাই বুদ্ধবাবুর ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করতে সুভাষ দল ছাড়বেন— এই চাপের খেলাটির নেপথ্য কারিগর ছিলেন শ্যামল চক্রবর্তী— এমনটাই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা। সুভাষের দল ছাড়ার প্রচারে যখন এতটুকু চিঁড়ে ভিজল না, তখন শ্যামলবাবুই, 'সুভাষদা আর যাই হোক দল ছাড়বেন না'— এই 'পবিত্র' প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

২০১১তে সুভাষের ছক পরিপূর্ণতা পায় বুদ্ধবাবু ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ভিতর দিয়ে। যদিও সুভাষ তখন প্রয়াত। এই ছক কিন্তু সুভাষ তাঁর ঘনিষ্ঠদের নিয়ে ছকতে শুরু করেছিলেন বুদ্ধবাবু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দিন থেকেই। সেই ছককে ফলপ্রসু করতে ইন্দিরা ভবনে বসে জ্যোতি বসুর সহায়ক জয়কৃষ্ণ ঘোষ আত্মনিবেদন করেছিলেন। তবে তাতে জ্যোতিবাবুর মদত ছিল— এমন কোনও প্রমাণ অবশ্য পাওয়া যায় না।

মহম্মদ সেলিম ২০০৪ সালের লোকসভা ভোটে জিতে জাতীয় রাজনীতিতে ফিরে যান। এই সময় থেকেই ক্যাবিনেটে নিরুপম সেন, সূর্যকান্ত মিশ্র ছাড়া বুদ্ধবাবুর প্রকৃত বন্ধু কার্যত কেউ ছিলেন না। মানব মুখার্জিরা যে আনুগত্যের অভিনয় করতেন, তা ছিল আর যাতে কেউ বুদ্ধবাবুর পরের জন হিসেবে উঠে আসতে না পারেন, সেই প্রচেষ্টার একটি অঙ্গ। আজ এক কঠিন সত্য মন না চাইলেও মানতেই হবে যে বুদ্ধবাবু তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের দশ বছরে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে যতখানি রাজনৈতিক বিরোধিতা পেয়েছিলেন, তার থেকে কম বিরুদ্ধতা পান নি তাঁর নিজের দলেরই একাংশের কাছ থেকে।

তাই ২০১১-র নির্বাচনে দেখা যায় জনমানসে বুদ্ধবাবুকে পরাজিত করবার মানসিকতা যতটা না ছিল, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি ছিল পাড়ায় পাড়ায় সুভাষ, শ্যামল, লক্ষণ, তড়িৎ, অনিল বসুদের হারানোর উদগ্র প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতা সামাজিক ক্ষেত্রে এতটাই ঘূর্ণাবর্ত তৈরি করে যে, বুদ্ধবাবু, নিরুপম সেন, মহঃ সেলিম, সূর্য মিশ্র প্রমুখ নেতাদের উপরেও সাধারণ মানুষের একটা বীতস্পৃহা তৈরি হয়। এঁদের ত্যাগ, তিতিক্ষা, আত্মনিবেদন— সবকিছুই হারিয়ে যায় মানুষের স্মৃতি থেকে। জেগে থাকে বর্ধমানে বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম বিধানসভার অধ্যক্ষ সৈয়দ মনসুর হাবিবুল্লাহের পৈতৃক সম্পত্তির জাল দলিল তৈরি করতে আইনুল হকের ভূমিকা ঘিরে প্রচার, অপপ্রচার। জেগে থাকে তড়িৎ তোপদারের কালো স্করপিয়ো গাড়ি আর দাদাবৌদির বিরিয়ানির মৌতাত। লক্ষণ শেঠের ফুলে ফেঁপে ওঠা ব্যবসা ঘিরে চোখ ধাঁধায় মানুষের। তাই বুদ্ধ বা তাঁর শুভাকাঙ্খী নিরুপম-সূর্য-সেলিম নন, আসলে সুভাষের ছায়া উপছায়া অনিল বসু, গৌতম দেব, মানব মুখার্জী, তড়িৎ তোপদার, রঞ্জিৎ কুন্ডু, মইনুদ্দিন শামস, ক্ষিতি গোস্বামী, নন্দগোপাল ভট্টাচার্যদের সরাতেই ঘটে যায় বুদ্ধবাবুদের সরানোর পালা।

(৪)

নেপালদেব ভট্টাচার্য, যিনি তখন সিপিআই(এম)-এর রাজ্য কমিটির সদস্য, শত্রু শিবিরের সঙ্গে সংযোগের অভিযোগে দল তাকে বিশেষ ধারা বলে সরাসরি বহিস্কার করে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতায় বিশ্বাসী সিপিআই(এম) তাঁদের দলের কোনও সভ্যকে বহিস্কার করতে গেলে সেই সভ্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়। তবে তাঁদের গঠনতন্ত্রে শত্রুপক্ষের সঙ্গে সম্পর্কের অভিযোগ দলীয় নেতৃত্বের কাছে প্রমাণিত

হলে কোনওরকম আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই বহিস্কারের বিধি আছে। নেপালবাবুকে সে ভাবেই বহিস্কার করেছিল সিপিআই(এম)।

বহিস্কৃত অবস্থায় নেপালদেবের সঙ্গে সুভাষ, শ্যামল, তড়িৎরা যথেষ্ট ঘনিষ্ট সম্পর্ক রেখেই চলতেন। শোনা যায় নেপালদেবের কৃতকর্মের জন্যে যে কঠিন অবস্থান এককালে জ্যোতি বসু নিয়েছিলেন, সেই অবস্থান থেকে ধীরে ধীরে জ্যোতিবাবুকে সরিয়ে আনতে ব্যক্তিগত প্রভাব পর্যন্ত বিস্তার করেছিলেন সুভাষ, শ্যামল। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরেই ধারণা, নেপালদেবের মত লোক, যার সঙ্গে

> **রাজনীতির বাইরে চুটকিকে রাজনীতির বিষয়বস্তু করে তোলার বুর্জোয়া মানসিকতা একটা বড় অংশের নয়া প্রজন্মের বামপন্থী নেতা ও কর্মীদের ভিতরে সঞ্চারিত হয়েছে। ফলে শ্রেণী রাজনীতির কথা বলা রাজনীতিকদের সেই অর্থে জনপ্রিয়তা নেই বামপন্থী সমর্থকদের ভিতরে। শ্রেণী রাজনীতিকে পাশ কাটিয়ে যাঁরা মজাদার কথার ভিতর দিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের উদ্দেশে ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক কথা বলতে পারেন, আজ জনপ্রিয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা সেইসব নেতানেত্রীদেরই।**

রাজনৈতিক সংযোগ অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বার্থ, এমনকী বিশেষ ধরণের মানুষদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কটাই প্রধান হয়ে ওঠে, এহেন ব্যক্তিকে কেবল দলে ফিরিয়ে আনাই নয়, বহিস্কারের সময়কালের রাজনৈতিক গুরুত্বে প্রতিষ্ঠিত করবার মাষ্টারমাইন্ড ছিলেন শ্যামল চক্রবর্তী। উদ্দেশ্য, উত্তর চব্বিশ পরগণাতে দলীয় সম্পাদক অমিতাভ বসুর প্রভাব খর্ব করা এবং বুদ্ধবাবুর উপর চাপের রাজনীতি বজায় রাখা।

২০১১ সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর এই নেপালদেবের একদা ঘনিষ্ট এক প্রাক্তন কাউন্সিলার আত্মঘাতী হন। সুইসাইড নোটে এক সময়ের সেই সিপিআই(এম) দলীয় সদস্য আত্মহত্যায় প্ররোচনার জন্যে সরাসরি নেপাল, তার পরিবারের কয়েকজন এবং ঘনিষ্ঠ কয়েকটি সিপিআই(এম) কর্মীকে অভিযুক্ত করেন। সদ্য তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এসেছেন। সিপিআই(এম)-এর নেতা, কর্মীদের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ পেলেই পুলিশ অতি সক্রিয়তা দেখাচ্ছে। এই অবস্থাতেও কিন্তু ওই সুইসাইড নোটে নাম থাকা একজনকেও পুলিশ ছোঁয় না। নেপাল আগাম জামিন চান জেলা আদালতে। পান না। হাইকোর্টে আগাম জামিন মেলে। শোনা যায়, নেপাল বা তার পরিবার ও ঘনিষ্ঠদের যে পুলিশ স্পর্শ করে নি তার পিছনে নাকি তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেসের মুকুল রায়ের বিশেষ ভূমিকা আছে। আজ পর্যন্ত এই মামলাটি নাকি ধামাচাপা অবস্থায় আছে।

এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, একদা যেসব বামপন্থী নেতা মমতাকে ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করেছিলেন, তারা ক্ষমতা হারানোর পর মমতার শাসনকালে কেমন আছেন। একাধিক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে এই সময়কালে বর্তমান নিবন্ধকারের কথা হয়েছে। পুলিশ অফিসারদের অনেকেই মমতার শাসনকালে ভূমিস্তরের দলীয় নেতৃত্বে থাকা একটা বড় অংশের বামপন্থী নেতাদের সাথে শাসক তৃণমূলের ভূমিস্তরের নেতাদের ঘনিষ্ঠতার রোমহর্ষক গল্প করেন। বস্তুত বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকাকালীন বিভিন্ন বামফ্রন্টভুক্ত দলগুলির নানা স্তরের নেতা, যারা সবথেকে বেশি সরকার থেকে সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছিলেন, ক্ষমতা হারানোর পর, সেই

অংশের নেতারাই তত বেশি বিপ্লবী হয়ে উঠে বুদ্ধ, নিরুপম, সুর্যদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শুরু করেন। এই কাজে অনেকক্ষেত্রে বামফ্রন্টভুক্ত দলগুলির রাজ্য দপ্তরে কর্মরত মানুষেরাও ছাপার অযোগ্য ভাষায় বুদ্ধ, নিরুপম, সূর্যদের আক্রমণ করতে শুরু করেন।

এমন এক ব্যক্তিকে জানা এই নিবন্ধকারের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। যিনি সরকারে থাকার সুযোগ কেবলমাত্র তার নিজের পরিবারের ক্ষেত্রেই নেয় নি, দলীয় তহবিল তছরূপের মত অভিযোগও যার বিরুদ্ধে উঠেছিল, সেই ব্যক্তি দল ক্ষমতা হারানোর পর দলের কর্মী, সমর্থকদের ভিতরে প্রচার করতেন যে বুদ্ধ, সূর্য, নিরুপম আর প্রয়াত অনিল বিশ্বাস মিলেই দলের রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সুপার সেক্রেটারিয়েট চালাতেন। তিনি দলের রাজ্য কমিটির বৈঠকে কী বলেছেন, কী ভাবে সূর্যবাবুকে আক্রমণ করেছেন, সেইসব বাইরে অক্লান্ত ভাবে বলতেন। বয়সের কারণে সেই ব্যক্তি রাজ্য কমিটি থেকে বাদ পড়েন। তারপরেও তিনি বলতে থাকেন, তাঁর তথাকথিত 'বিদ্রোহ'র জন্যেই সূর্যবাবুর বিরাগভাজন হয়ে তিনি রাজ্য কমিটি থেকে বাদ পড়েছেন।

বামপন্থীরা যে ক্ষমতা হারানোর পর গত দশ বছরে সেভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারেন নি, তার সবথেকে বড় কারণ হল এই অংশের লোকগুলি। তাই আমরা দেখতে পাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতায় এসেই মহঃ সেলিমের পত্নী, চিত্তরঞ্জন শিশু হাসপাতালের কর্মরত চিকিৎসককে তাঁর সরকারী বাসভবন থেকে উৎখাত করতে। বিমান বসু তখন সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক। মমতার এই ব্যক্তি আক্রমণাত্মক ভূমিকা ঘিরে নিন্দায় কিংবা মিথ্যে অভিযোগ দাবিতে কিন্তু সেদিন বিমানবাবুকে দলের পক্ষ থেকে মুখ খুলতে দেখা যায় নি। ব্যক্তি সেলিমকে আক্রমণ যে সেদিন গোটা বামপন্থী আন্দোলনকেই আক্রমণের সমার্থক হয়ে উঠেছিল, সেটা কিন্তু মানুষের কাছে তুলে ধরবার ক্ষেত্রে একাংশের নেতৃত্বের ভিতরে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাব ছিল না। ছিল ব্যক্তিগত অসূয়া।

বিগত দশ বছরের একটা বড় বৈশিষ্ট্য বামপন্থী রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রথাগত আন্দোলনের অভিমুখ থেকে সরে গিয়ে আধুনিকতার অন্বেষণ। এই খোঁজের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি নির্ভরতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তবে এই প্রযুক্তি বান্ধব করবার দায়িত্বে নতুন প্রজন্মের যেসব কর্মী থাকছেন, তাঁদের সামনে পছন্দের নেতাদেরকেই বেশি হাইলাইট করবার মধ্যেই এই নতুন আঙ্গিকের প্রচার সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে। তাই বামপন্থী আন্দোলনের যেটা মূল কথা, শ্রেণী আন্দোলন সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্র করা, সেই মূল কাজটিই বিশেষ রকম ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। রাজনীতির বাইরে চুটকিকে রাজনীতির বিষয়বস্তু করে তোলার বুর্জোয়া মানসিকতা একটা বড় অংশের নয়া প্রজন্মের বামপন্থী নেতা ও কর্মীদের ভিতরে সঞ্চারিত হয়েছে। ফলে শ্রেণী রাজনীতির কথা বলা রাজনীতিকদের সেই অর্থে জনপ্রিয়তা নেই বামপন্থী সমর্থকদের ভিতরে। শ্রেণী রাজনীতিকে পাশ কাটিয়ে যাঁরা মজাদার কথার ভিতর দিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের উদ্দেশে ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক কথা বলতে পারেন, আজ জনপ্রিয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা সেইসব নেতানেত্রীদেরই।

এই ধরণের চটুল, ব্যক্তি আক্রমণাত্মক কথা বলে একটা সময়ে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীতে তাঁর কী পরিণতি হয়েছে, তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা বড় অংশের নবীন প্রজন্মের কর্মীদের এই ধরণের কথাবার্তার ক্ষেত্রে কোনও লাগাম বামপন্থী নেতৃত্ব পরাচ্ছেন না। ছাত্রযুব রাজনীতির ভিতর দিয়ে সাম্প্রতিক অতীতে রাজনীতির অঙ্গনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন আভাস রায়চৌধুরী, সোমনাথ ভট্টাচার্য, পলাশ দাসেরা। এঁরা যখন ছাত্র-যুব রাজনীতি করেছেন, তখন কিন্তু কোনও প্রগলভতা বা অরাজনৈতিক চটকদারি স্বভাব এঁদের ভিতরে দেখতে পাওয়া যায় নি। বৈদগ্ধ এবং রসবোধের যে গভীর সংমিশ্রণ দিয়ে রাজনীতিকে একটা ভিন্ন মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন সৈফুদ্দিন চৌধুরী, মহঃ সেলিমেরা, আভাস-সোমনাথ-পলাশ সুমিত দে-রা কিন্তু হলেন সেই ধারারই সার্থক উত্তরসূরি।

প্রতিবেদক গৌতম রায় একজন বামপন্থী ঘরানার রাজনৈতিক বিশ্লেষক, সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস বিষয়ক গবেষক।

মাইক্রোওয়েভ গবেষণায় উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা

রাজেশ্বরী চট্টোপাধ্যায়

রাখি পুরকায়স্থ

১৯৪৭ সাল। ভারত স্বাধীন হতে তখনও এক মাস বাকি। ২৫ বছরের এক তরুণী জাহাজে চেপে একাকী পাড়ি দিলেন মার্কিন মুলুকে। কলম্বো, সিঙ্গাপুর, হংকং, সাংহাই হয়ে সানফ্রান্সিকো যাবে এসএস মেরিন অ্যাডার নামে সেই জাহাজ। পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই একাকী দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা করতে গিয়ে তরুণীটি কি একটুও ভয় পান নি? হ্যাঁ, ভয় লেগেছিল তাঁর! ভীষণ ভয় এসে আচ্ছন্ন করেছিল তাঁকে। তবে তা কয়েক মুহূর্তের জন্যে। ভয় তাঁকে মোটেই কাবু করতে পারল না। পারবে কীভাবে? বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন যে তাঁর প্রাণমন জুড়ে। ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে তো আর বিজ্ঞানী হয়ে ওঠা হবে না। তাই এক লহমায় ভয়কে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে অনিশ্চিত আগামীকে অসীম সাহসে আলিঙ্গন করলেন তিনি।

তাঁর সেই নির্ভয় আলিঙ্গনের ফলশ্রুতিতে সুগম হল ভবিষ্যতের ভারতীয় নারী বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের উত্তরণের সোপান। তরুণীটির নাম ডঃ রাজেশ্বরী চট্টোপাধ্যায়— কর্ণাটকের প্রথম নারী প্রকৌশলী, যিনি ভারতে মাইক্রোওয়েভ এবং অ্যান্টেনা ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক গবেষণার অগ্রগতিতে অসামান্য অবদান রেখে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

একাকী দীর্ঘ সমুদ্রপথ অতিক্রমণ কালে রাজেশ্বরীর মনে যে নতুন সাহসের সঞ্চার ঘটেছিল, সেই অদম্য সাহস তাঁর গোটা জীবন জুড়ে স্থায়িত্ব লাভ করে। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি সেই অসীম মনোবলের পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। সম্ভবত তাঁর পিতামহী, প্রখ্যাত সমাজসংস্কারক,কমলাম্মা দাসাপ্পার কাছ থেকে এই 'হার-না-মানা'রগুণটি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন রাজেশ্বরী। মাত্র ২০ বছর বয়সে কমলাম্মা দাসাপ্পা বিধবা হলে, তাঁর পিতা গোটা পরিবারকে নিয়ে মহীশূর থেকে মাদ্রাজে চলে যান, যাতে তাঁর কন্যা নির্বিবাদে সেখানে পড়াশোনা করতে পারেন। পিতার মনস্কামনা পূরণ করে কমলাম্মা কৃতিত্বের সঙ্গে বিএ ডিগ্রি লাভ করেছিলেন এবং নারী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে তাঁর বাকি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা এবং অল্পবয়সী মেয়েদের জন্য ব্যাঙ্গালোরের (অধুনা ব্যাঙ্গালুরু) বাসাভানাগুড়িতে অবস্থিত মহিলা সেবা সমাজে একটি পরীক্ষামূলক ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কমলাম্মা দাসাপ্পা। কর্নাটকের প্রথম নারী স্নাতকদের মধ্যে অন্যতমা এবং নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারী কমলাম্মা দাসাপ্পার নাতনীই তো রাজেশ্বরী— এ কথা ভুলে গেলে চলবে কেন!

ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্য মহীশূরের (অধুনা কর্ণাটক রাজ্যের মহীশূর জেলার) নঞ্জনগুড় শহরে ১৯২২ সালের ২৪ জুলাই একটি উচ্চবংশীয় কন্নড় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন রাজেশ্বরী। তাঁর পিতা বি.এম. শিবরামাইয়া নঞ্জনগুড় আদালতে ওকালতি করতেন। স্বাধীনতাপূর্ব ভারতে ইচ্ছেমত পড়াশোনা তো অনেক দূরের কথা, সমাজ সৃষ্ট লিঙ্গ-প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে পড়াশোনা করাটাই নারীদের পক্ষে খুব শক্ত ছিল। এমন একটি কট্টর পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোয় নারীদের জীবন যখন নিয়ন্ত্রিত হত লিঙ্গবৈষম্যমূলক অনুশাসনের মধ্যে, তখন প্রগতিশীল পিতামহী কমলাম্মা দাসাপ্পা প্রতিষ্ঠিত সেই বিদ্যালয়টিতে অত্যন্ত মেধাবী রাজেশ্বরী নিজের পছন্দমত বিষয়ে পড়াশোনা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

সে-আমলে অঙ্গুলিমেয় নারীরা বিজ্ঞান পড়তেন। অন্যভাবে বললে, ইচ্ছে থাকলেও পরিবার তথা সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে অধিকাংশ নারীরাই বিজ্ঞান পড়বার সাহস যোগাতে পারতেন না। রাজেশ্বরীর পরিবার ছিল ব্যতিক্রমী। পরিবারের সকলের,

সে-আমলে অঙ্গুলিমেয় নারীরা বিজ্ঞান পড়তেন। অন্যভাবে বললে, ইচ্ছে থাকলেও পরিবার তথা সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে অধিকাংশ নারীরাই বিজ্ঞান পড়বার সাহস যোগাতে পারতেন না। রাজেশ্বরীর পরিবার ছিল ব্যতিক্রমী।

বিশেষত ঠাকুমার, প্রচণ্ড উৎসাহে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন শেষে সেন্ট্রাল কলেজ অব ব্যাঙ্গালোরে বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক স্তরে ভর্তি হন রাজেশ্বরী। বিশেষ বিষয় ছিল পদার্থবিজ্ঞানও গণিত। ১৯৩৯ সালে তিনি সাম্মানিকসহ বিজ্ঞানে স্নাতক হন। ১৯৪২ সালে ওই কলেজ থেকেই গণিতে স্নাতকোত্তর পাঠ সম্পন্ন করেন। উচ্চশিক্ষা লাভে স্থিরসংকল্প ও সমর্পিত প্রাণ রাজেশ্বরী মহিশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর দুটি পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করেন। বিএসসি (অনার্স) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করবার জন্য লাভ করেন মুম্মাদি কৃষ্ণরাজাওয়াদেয়ার পুরস্কার। এমএসসি পরীক্ষায়

প্রথম স্থান অধিকার করে পেয়েছিলেন এমটি নারায়ণা আয়েঙ্গার পুরস্কার এবং ওয়াটার্স মেমোরিয়াল পুরস্কার।

তৎপরবর্তী কালে রাজেশ্বরী ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইন্সিটিউট অব সায়েন্সে (আইআইএসসি) আবেদন করেন, নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ সিভি রমনের অধীনে গবেষণা করবার জন্য। তাঁর সে-আবেদন গৃহীত হয় নি। অনেকে বলেন, রাজেশ্বরীর পদার্থবিজ্ঞানে কোনও ডিগ্রি ছিল না বলে ডঃ রমন তাঁকে গবেষণার কাজে নিতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু তখন প্রশ্ন ওঠে— কেবলমাত্র পদার্থবিজ্ঞানে ডিগ্রি না-থাকাটাই কি এক্ষেত্রে অন্তরায় হয়েছিল, নাকি নারী বলেই ডঃ রমন তাঁকে প্রত্যাখ্যান

রাজেশ্বরী চট্টোপাধ্যায়

করেছিলেন? ইতিহাস সাক্ষী, ডঃ রমন বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে নারীদের অবাধ বিচরণকে উদার চোখে দেখেন নি। দুর্ভাগ্যবশত, আজ আর এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানবার উপায় নেই। তবে প্রত্যাখ্যানের আসল কারণ যা-ই হোক না কেন, এতে কিন্তু রাজেশ্বরী একেবারেই দমে যান নি। ১৯৪৩ সালে তিনি সেই আইআইএসসি-তেই তৎকালীন ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলোজি বিভাগের অন্তর্গত কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে, অধ্যাপক এস.পি চক্রবর্তীর অধীনে, একজন গবেষক-শিক্ষার্থী হিসাবে যোগদান করেন। সেখানে তিনি ইলেকট্রনিক্স, বিশেষ করে অতি-উচ্চ কম্পাঙ্ক পরিমাপন, বিষয়ে গভীর গবেষণায় লিপ্ত হন। এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় না বললেই নয়— আইআইএসসিতে গবেষণা করবার সময়েই ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গী ডঃ শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজেশ্বরীর প্রথম দেখা হয়। ইনিই সেই ডঃ শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায় যিনি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস কর্তৃক ১৮৯৪ সালে আবিষ্কৃত, মাইক্রোওয়েভ গবেষণার অগ্রগতিতে অপরিমেয় অবদান রেখে বিখ্যাত হয়েছেন।

১৯৪৫-১৯৪৭ সালের মধ্যবর্তী সময়কালে ব্রিটিশেরা ভারত ত্যাগ করবার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলে, রাজধানী দিল্লিতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে দেশে বিজ্ঞানচর্চাকে উৎসাহিত করবার সংকল্প গৃহীত হয়। সে-উদ্দেশ্যে মেঘনাদ সাহা, শান্তিস্বরূপ ভাটনগর, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, কে. শ্রীনিবাসা কৃষ্ণান এবং হোমি ভাবার মত খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে একটি বৈজ্ঞানিক কমিটি গঠিত হয়। কমিটি-সদস্যেরা সরকারকে প্রোৎসাহিত করেন, মেধাবী ভারতীয় বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন কিংবা কানাডায় গিয়ে গবেষণা করবার সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে সরকারি বৃত্তি প্রদান কর্মসূচী গ্রহণ করতে। ১৯৪৬ সালে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এই মর্যাদাপূর্ণ বৃত্তির জন্য মনোনীত হন রাজেশ্বরী। শর্ত একটাই, বিদেশে পড়াশোনা শেষে স্বদেশে ফিরে এসে কমপক্ষে তিন বছর নবগঠিত ভারতের সেবা করতে হবে।

উন্নত শিক্ষালাভের সুযোগ হাতছাড়া করতে নারাজ ছিলেন রাজেশ্বরী। তাই ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার ঠিক একমাস আগে, একাকী জাহাজে চেপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে যাত্রা করেন তিনি। প্রায় এক মাস ব্যাপী সমুদ্রযাত্রার পর পা রাখেন বিদেশের মাটিতে। ভর্তি হন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে, এবং যথা সময়ে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তারপর ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী, ওয়াশিংটন ডিসির ন্যাশনাল ব্যুরো অব স্ট্যান্ডার্ডসে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি

মেজারমেন্ট বিভাগে আট মাসের প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষ হতেই তিনি আবার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার কাজে ফিরে যান, এবং অধ্যাপক উইলিয়াম ডাওয়ের অধীনে গবেষণা করে ১৯৫৩ সালে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

কেবলমাত্র শিক্ষালাভের জন্য একজন নারী একাকী বিদেশ বাস করছেন, এমন ঘটনা সে-আমলে ছিল বিরল। পরিবারের সমর্থন ও উৎসাহ ব্যতীত তা বাস্তবায়িত হওয়া ছিল অসম্ভব। রাজেশ্বরীর একাকী বিদেশ বাস ও উচ্চতর শিক্ষালাভে পরিবারের অকুণ্ঠ সমর্থন থাকলেও, এ কথা ভুলে গেলে চলবে না, সেটা ছিল এমন এক সময় যখন সাগর পেরিয়ে একাকী বিদেশ গমন ও বাস নারীদের পক্ষে কলঙ্কজনক বলে বিবেচিত হত। তাঁদের চরিত্র নিয়েও সমাজে নানান প্রশ্ন উঠত। রাজেশ্বরী কি বিদেশ যাত্রার আগে এমত প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন নি? নিশ্চয়ই হয়েছেন। তবে কুৎসা-অপবাদকে তোয়াক্কা না করেই দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছেন অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে। বিদেশ যাত্রার সময় তিনি যে কেবলমাত্র ভয়কে জয় করেছিলেন তাই-ই নয়, তিনি তাঁর যাত্রাটি উপভোগও করেছিলেন। সেই আত্ম আবিষ্কার ও উপলব্ধির কাহিনি তাঁর লেখা A Thousand Streams- A Personal History শীর্ষক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটিতে সুচারু রূপে বর্ণিত হয়েছে।

পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের পরে ১৯৫৩ সালে ডঃ রাজেশ্বরী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ব্যাঙ্গালোরে অবস্থিত আইআইএসসি-র ইলেকট্রিক্যাল কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অনুষদ সদস্য হিসাবে যোগদান করেন। তিনিই আইআইএসসি-র প্রথম নারী অনুষদ সদস্য। সে-বছরই তিনি ডঃ শিশির কুমার চটোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পরে 'চট্টোপাধ্যায়' পদবী গ্রহণ করেন রাজেশ্বরী, এবং পরবর্তী জীবনে ডঃ রাজেশ্বরী চট্টোপাধ্যায় নামেই অধিক পরিচিতি লাভ করেন।

বিবাহ পরবর্তীকালে রাজেশ্বরীও শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায় মাইক্রোওয়েভ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে যৌথভাবে গবেষণা শুরু করেন। শীঘ্রই স্থাপন করেন একটি অভিনব মাইক্রোওয়েভ ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণাগার। সারা বিশ্বেই মাইক্রোওয়েভ গবেষণা তখন আরভমাণ পর্যায়ে ছিল, তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে উন্নতি করছিল দ্রুত গতিতে। চট্টোপাধ্যায় দম্পতিই ভারতে প্রথম এ-বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা শুরু করেন, এবং ষাটের দশকে মাইক্রোওয়েভ প্রযুক্তি এবং স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন বিষয়ের পাঠ্যক্রম তৈরি করেন। ভারতে তাঁরাই প্রথম এই বিষয়টি ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো শুরু করেন। সে-আমলে গবেষণাগারের জন্য প্রাপ্ত অনুদানের পরিমাণ ছিল অপর্যাপ্ত। তাই তাঁরা বাধ্য হয়েছিলেন পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি ব্যবহার করে গবেষণাগার গড়ে তুলতে। উন্নতমানের বিদেশি যন্ত্রপাতির অভাব থাকায়, দেশীয় উপাদান ব্যবহার করে তাঁদের গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপাংশ প্রস্তুত করেছিলেন।

সে-আমলে অঙ্গুলিমেয় নারীরা বিজ্ঞান পড়তেন। অন্যভাবে বললে, ইচ্ছে থাকলেও পরিবার তথা সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে অধিকাংশ নারীরাই বিজ্ঞান পড়বার সাহস যোগাতে পারতেন না। রাজেশ্বরীর পরিবার ছিল ব্যতিক্রমী।

ডঃ রাজেশ্বরী চট্টোপাধ্যায় ক্রমে আইআইএসসি-র অধ্যাপক পদ লাভ করেন এবং ইলেক্ট্রিক্যাল কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যানের পদ অলঙ্কৃত করেন। একজন দক্ষ ও কঠোর নিয়মানুবর্তী শিক্ষক হিসেবে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর পড়ানোর বিষয় ছিল— তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্ব, ইলেক্ট্রন টিউব সার্কিট, মাইক্রোওয়েভ প্রযুক্তি ও রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং। তবে শুধুমাত্র শিক্ষকতা নয়, তিনি গবেষণাতেও অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। ৩০ বছরের পেশাগত জীবনে ২০ জন

গবেষক-শিক্ষার্থী তাঁর অধীনে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। দেশি-বিদেশি বিজ্ঞান সাময়িকীতে তাঁর লেখা ১০০টিরও বেশি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। তিনি যে কেবল ভারতে মাইক্রোওয়েভ বিজ্ঞান গবেষণার পথিকৃৎ তা-ই নয়, অ্যান্টেনা ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত তাঁর গবেষণা বিমান ও মহকাশযানে যুক্ত অ্যান্টেনার উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখেছে। সেই সঙ্গে তিনি লিখেছিলেন সাতটি অত্যন্ত মূল্যবান বই। সে-বইগুলি হল— ১) Elements of Engineering ২) Antenna Theory And Practice ৩) A Thousand Streams- A Personal History ৪) Dielectric

ডঃ রাজেশ্বরী চট্টোপাধ্যায় ক্রমে আইআইএসসি-র অধ্যাপক পদ লাভ করেন এবং ইলেক্ট্রিক্যাল কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যানের পদ অলঙ্কৃত করেন। একজন দক্ষ ও কঠোর নিয়মানুবর্তী শিক্ষক হিসেবে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

And Dielectric Loaded Antennas ৫) Advanced Microwave Engineering- Special Advanced Topics ৬) Vasudhaiva Kutumbakam- The Whole World Is But One Family- Real Stories of Some Women and Men of India ৭) Antennas for Information Super Skyways- An Exposition on Outdoor and Indoor Wireless Antenna (সহ-লেখকঃ পেরাম্বুর এস নীলাকান্ত)।

ডঃ রাজেশ্বরী চ্যাটার্জির অসামান্য ব্যক্তিত্বের উল্লেখব্যতিরেকে তাঁর সম্পর্কে বলা সম্পূর্ণ হয় না। বিজ্ঞানের পুরুষ প্রাধান্যপূর্ণ ক্ষেত্রে তাঁর উত্তরণের পথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। আপষহীন লড়াই করেই নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করতে হয়েছিল। নিজেকে ‘ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্টিস্ট’ হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করতেন তিনি। কঠিন বিষয়গুলি সহজবোদ্ধ করে তুলবার অসাধারণ গুণের জন্য ছাত্রছাত্রী মহল ও গবেষক দলের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। আইআইএসসি-র অন্যান্য গবেষণাগারের তুলনায়, তাঁর মাইক্রোওয়েভ গবেষণাগারে সর্বদাই অনেক বেশি সংখ্যক মহিলা শিক্ষার্থী-গবেষকদের দেখা যেত। তিনি বুঝেছিলেন, বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে নারী বিজ্ঞানীদের সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত ও শিক্ষাগত সমস্যায় পাশে দাঁড়িয়েছেন বারবার। তাঁর বাড়ির দরজা সবসময় ছাত্রছাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত থাকত। তাঁর উদারতা ছিল সর্বজনবিদিত। আশ্চর্য স্মৃতিধর ছিলেন তিনি। কাউকেই সহজে বিস্মৃত হতেন না। পরিচিত সকলের খোঁজখবর রাখতেন, বিপদে-আপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন নিঃস্বার্থভাবে। ক্রমশ হয়ে উঠেছিলেন ছাত্রছাত্রীদের ‘মা’!

১৯৮১ সালে আইআইএসসি-র ইলেক্ট্রিক্যাল কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যানের পদে থাকাকালীন অবসর গ্রহণ করেন ডঃ রাজেশ্বরী চট্টোপাধ্যায়। তবে পেশাগত জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করলেও তাঁর কর্মতৎপরতা কিন্তু একটুও স্থিমিত হল না। যুক্ত হলেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর উইম্যান স্টাডিজের সঙ্গে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া মহিলাদের জীবন সংগ্রামে। একটি উচ্চশিক্ষিত, প্রগতিশীল ও সহানুভূতিশীল পরিবারে জন্মানোর সুযোগ-সুবিধেগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন তিনি। বুঝতেন, এ-ক্ষেত্রে ভাগ্য তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন হলেও, এ দেশের অধিকাংশ সুবিধা বঞ্চিত নারীদের জীবনপথ জন্মাবধি কন্টকাকীর্ণ। তাই দরিদ্র লড়াকু নারীদের শিক্ষা ও স্বাবলম্বনের সুযোগ-সুবিধে প্রদান করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সেইসঙ্গে উদ্যোগী হয়েছিলেন জাতি-বর্ণবিভাজন, লিঙ্গবৈষম্য এবং আর্থিক

অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত নানান সমস্যা সমাধানে। তাঁর আত্মবিশ্বাস, জীবন সম্বন্ধে ইতিবাচক মনোভাব ও মানবতাবোধ বহু নরনারীর জীবনকে ছুঁয়ে গিয়েছিল।

মাইক্রোওয়েভ বিজ্ঞানে গবেষণামূলক অবদানের জন্য এই মহান প্রকৌশলী-বিজ্ঞানীকে অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করা হয়। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য— যুক্তরাজ্যের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট প্রদত্ত মাউন্টব্যাটেন পুরস্কার, ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স প্রদত্ত জগদীশ চন্দ্র বোস স্মৃতি পুরস্কার, ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার্স প্রদত্ত রামলাল ওয়াধওয়া পুরস্কার।

ডঃ রাজেশ্বরী চট্টোপাধ্যায়ের কর্মবহুল জীবনে প্রাণময়তা ও উদ্যমের অন্যতম উৎস ছিলেন তাঁর জীবনসঙ্গী। তবে সাংসারিক জীবনে ডঃ শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিনী ও পেশাগত জীবনে তাঁর সহকর্মিনী হওয়া সত্ত্বেও, ডঃ রাজেশ্বরী চট্টোপাধ্যায় নিজের স্বতন্ত্র পরিচিতি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। চট্টোপাধ্যায় দম্পতি একই গবেষণাগারে একই বিষয়ে গবেষণায় নিয়োজিত থাকলেও, বিজ্ঞানের জগতে যে স্বাধীন অবদান ডঃ রাজেশ্বরী চট্টোপাধ্যায় রেখেছিলেন, তাতে তিনি একজন সফল বৈজ্ঞানিক হিসেবে অমর হয়ে আছেন।

১৯৯৪ সালে অধ্যাপক শিশির কুমার চটোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন। ডঃ রাজেশ্বরী চট্টোপাধ্যায় কিন্তু তার পরেও সক্রিয় থেকেছেন। নিজের শর্তে বাঁচবার আদর্শ দৃষ্টান্ত তাঁর ঘটনাবহুল জীবন। এমনকি নেভাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেক্ট্রিক্যাল ও বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক একমাত্র কন্যা ডঃ ইন্দিরা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে দিব্যি একাকী ৮৮ বছর বয়সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দিয়েছিলেন। এমনই ছিল তাঁর মানসিক ক্ষমতা। ২০১০ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে একাকী দেশে ফিরে আসবার কয়েকদিন পরে, মল্লেশ্বরমে আচমকা নিজ বাসভবনে ভূপতিত হন। আমৃত্যু শিরদাঁড়া সোজা করে হেঁটে চলা এই অকুতোভয় বিজ্ঞান সাধিকা ২০১০ সালে ৩ সেপ্টেম্বর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ডঃ রাজেশ্বরী চট্টোপাধ্যায়ের সারা জীবনের গবেষণা মূলত প্যাসিভ মাইক্রোওয়েভ ডিভাইস, বিশেষ করে গাইডেড এবং রেডিয়েটেড ওয়েভ ডিভাইসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। তাঁর বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকর্ম আজও প্রাসঙ্গিক, বিশেষত প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে। একবিংশ শতাব্দীর অত্যাধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে পদার্পণ করেও, তাঁর মাইক্রোওয়েভ ও অ্যান্টেনা প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা লব্ধ ফলাফলগুলি ভারতের ডিসেন্স রিসার্চ এন্ড ডেভেলাপমেন্ট অরগেনাইজেশন দ্বারা রাডার

ডঃ রাজেশ্বরী চট্টোপাধ্যায়ের মাইক্রোওয়েভ ও অ্যান্টেনা প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা লব্ধ ফলাফলগুলি ভারতের ডিসেন্স রিসার্চ এন্ড ডেভেলাপমেন্ট অরগেনাইজেশন দ্বারা রাডার প্রযুক্তি এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

প্রযুক্তি এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাঁর লেখা বইগুলিও সময়কে হার মানিয়ে ছাত্রছাত্রী ও প্রকৌশলীদের সঠিক দিক নির্দেশ করে চলেছে। বর্তমান সময়ে বহু ভারতীয় নারী মাইক্রোওয়েভ বিজ্ঞান গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছেন। তাদের মধ্যেই অনেকেই হয়তো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। তবে ভুলে গেলে চলবে না, ডঃ রাজেশ্বরী চট্টোপাধ্যায়ের মতো দিগদর্শী গবেষক ও শিক্ষক অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন বলেই ভারতে নারী বিজ্ঞানীদের এগিয়ে যাওয়ার পথ সুপ্রশস্ত হয়েছে। এভাবেই ডঃ রাজেশ্বরী চট্টোপাধ্যায়ের বিস্ময়কর উত্তরাধিকার বেঁচে রয়েছে গোটা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা তাঁর অসংখ্য সফল ছাত্রছাত্রীর সাফল্যমণ্ডিত বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে।

গ্রামীণ ব্যাংক ও উত্তরের উত্তরণ লিপি

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

গত চার দশকে ধরে উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে কতটা বদল এনেছে উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংক? কতটা এখনও বাকি রয়ে গিয়েছে? প্রত্যন্ত উত্তরবাংলার দরিদ্র মানুষগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক চেতনা জাগানো ও স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে যেটুকু বদল ঘটেছে তা একদিনে হয় নি, ব্যাংক কর্মীদের সমবেত প্রচেষ্টায় তা তিলে তিলে হয়েছে। পিছিয়ে পড়া উত্তরের বিবর্তনের পথে সেসব কথাগুলি কি কোথাও লেখা রইবে না? অবসরপ্রাপ্ত গ্রামীণ ব্যাংক কর্মী ও এই ব্যাংকের প্রথম নিজস্ব ব্রাঞ্চ ম্যানেজার প্রশান্ত নাথ চৌধুরী এবার থেকে ধারাবাহিক লিখতে শুরু করলেন তাঁদের উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের গোড়া থেকে গড়ে ওঠার গল্প। স্মৃতি হাতড়ে বের করে আনছেন নানান টুকরো টুকরো কথা ও কাহিনি।

প্রথম যেদিন একা কোচবিহার সার্কিট হাউসে ডিসিসি মিটিং-এ গেলাম সেদিন একটু নার্ভাস ছিলাম। মূল আলোচনা, কোন প্রকল্পে কোন ব্যাঙ্কের কত টার্গেট এবং তার কতটুকু অর্জিত হয়েছে। সামনে জেলা শাসকসহ পদস্থ অফিসাররা সব বসে। অকারণে ব্যাঙ্ক কর্তাদের মুখ গম্ভীর, আমাদের পাত্তাই দিচ্ছেন না। কিন্তু এটা বুঝলাম অনেকেরই প্রকল্প সম্বন্ধে সম্যক ধারনা নেই। যাঁরা জানেন তাঁরাই মিটিং-এর মুখ্য বক্তা। কিন্তু আমরা জানতাম আমাদের ব্যাংক সরকারি প্রকল্পে যথেষ্ট ঋণ দিয়ে থাকে, আর মাঠের অবস্থা বা গ্রাউন্ড রিয়ালিটি বলতে যা বোঝায় অন্যদের থেকে আমরাই বেশি ওয়াকিবহাল।

তিন চারটে মিটিং-এ উপস্থিত থাকার পর আমরাও মাঠের সমস্যা নিয়ে আলোচনায় অংশ নিতে শুরু করেছিলাম। হঠাৎ দাস সাহেব মুম্বাই গেলেন জরুরি মিটিঙে। আমাকে বললেন কলকাতায় ইউ.বি.আই. এর প্রধান কার্যালয়ে এস.এল.বি.সি. (স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটি) মিটিঙে যেন যাই। এইসব মিটিঙে যোগদান আমাদের সঙ্কোচ ধীরে ধীরে দূর করছিল। অন্যদিকে ডিসিসি মিটিং-এ আমাদের কণ্ঠস্বর ক্রমশ জায়গা করে নিচ্ছিল। এদিকে গ্রামীণ ঋণে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। গরীব মানুষ, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বর্গাদার, ছোট ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প আর তপশিলী জাতি-উপজাতি শ্রেণীভুক্ত মানুষদের কাছে ঋণ পৌঁছে দিয়ে তাদের হৃদয় জয় করে নিয়েছিল।

প্রায় শুরু থেকেই Reserve Bank of India Act ১৯৩৪ এর Section 42 অনুযায়ী সি.আর.আর (ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও) বজায় রাখার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কলকাতা শাখায় আমাদের ব্যাঙ্কের প্রিন্সিপাল

আক্যাউন্ট খোলা হয়েছিল। সংক্ষেপে বললে ব্যাঙ্কের মোট ডিপোজিটের একটা ঘোষিত অংশ প্রিন্সিপাল আক্যাউন্টে সঞ্চিত রাখতে হয়। শুরুতে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের জন্য নির্ধারিত মোট সঞ্চয়ের ৩% (নেট অফ ডিমান্ড এন্ড টাইম লায়াবিলিট- NDTL) টাকা প্রিন্সিপাল আক্যাউন্টে রাখতে হত এবং ফর্ম-A তৈরি করে পাঠাতে হত। এজন্য প্রতিটি শাখা থেকে সাপ্তাহিক GLB কপি সংগ্রহ করে একত্রীভূত করতে হত। সে সময়টায় নেট নেই, কম্পুটার নেই, মোবাইল নেই, হোয়াটস অ্যাপ নেই এমনকী বিএসএনএল-এর কালো ল্যান্ড ফোনগুলোও সর্বত্র নেই। অথচ সময় মত প্রিন্সিপাল আক্যাউন্টে টাকা পাঠাতে হবে, নতুবা ফাইন হতে পারে এবং এসব সংক্রান্ত পুরো তথ্য বোর্ড মিটিঙে পেশ করতে হয়। সেকালে প্রিন্সিপাল আক্যাউন্টে গচ্ছিত টাকার উপর ব্যাঙ্কগুলো কোনও সুদ পেত না। ডিফল্টের ইতিহাস তখন আমাদের খুব বেশি ছিল না।

আসলে সি.আর.আর-এর মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাজারের আর্থিক তরলতা (লিকুইডিটি) বজায় রাখে। বর্তমানে যদি ০.২৫% সি.আর.আর বৃদ্ধি পায় তাহলে ব্যাঙ্কগুলো থেকে প্রায় কুড়ি হাজার কোটি টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঘরে জমা পড়বে। একইরকমভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি সি.আর.আর ০.২৫% কমিয়ে দেয় তবে কুড়ি হাজার কোটি নগদ টাকা ব্যাঙ্কগুলোর হাতে চলে আসবে এবং সেই টাকা ঋণের কাজে ব্যবহার করতে পারবে।

অন্যদিকে ‘ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন অ্যাক্ট ১৯৪৯’ এর অনুচ্ছেদ ২৪ অনুযায়ী গ্রাহকদের নগদ টাকার চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যাঙ্কের নিজস্ব ক্যাশ ও তার সঙ্গে যে টাকা অন্য ব্যাঙ্কে আমানত রূপে আছে বা যে মূল্যের সোনা যা নিজের কাছে মজুত আছে তার মোট পরিমাপ করে আর.বি.আই. নির্ধারিত শতাংশ হাতে রাখতে হবে। একে বলা হয় স্ট্যাটুটারি লিকুইডিটি রেশিও (SLR)। যখনকার কথা বলছি সে সময় SLR ছিল ২৫ শতাংশ। এক কথায় বলতে গেলে ব্যাঙ্কের মোট ডিপোজিটের একটা মোটা অংশ ক্যাশ আকারে রাখতে হয়, যাতে গ্রাহকদের নগদের চাহিদা মেটাতে কোনও অসুবিধে না হয়।

চাকরিতে সদ্য ঢুকে এসব খিটকেলে বিষয় বুঝতে এবং সে সব নিয়ে কাজ করতে খুব অসহায় বোধ করতাম। প্রথমবার এস.এল.বি.সি. মিটিঙে কলকাতা যাই, রাত জেগে বাসে চেপে। কয়েকদিন আগেই নির্ধারিত স্টেটমেন্ট এস.এল.বি.সি-তে পাঠিয়েছিলাম দাস সাহেবের তাগাদায়, মিটিঙের হাওয়া দেখে বুঝলাম অনেকেই নির্দিষ্ট স্টেটমেন্ট পাঠায় নি। একজন লিড ব্যাঙ্ক অফিসার কিন্তু কিন্তু করছিলেন বলে এক সিনিয়র অফিসার মৃদু ধমকও দিলেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি বলেছিলেন “উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে কে এসেছেন”? আমি দুরুদুরু বক্ষে উঠে দাঁড়ালাম। উনি বললেন “আপনাদের কাছে অনেকগুলো ব্রাঞ্চ লাইসেন্স পড়ে আছে। ব্রাঞ্চ ওপেন না করতে পারলে সারেন্ডার করুন”। আমি জেলাওয়ারি কবে কোন শাখা খোলা হবে বিস্তারিত জানালাম। উত্তরে ওরা সন্তুষ্ট বোঝা গেল। পাশ থেকে একজন বললেন “প্রদীপ কোথায়? আর তুমি কে গো”? আমি ফিসফিস করে উত্তর দিয়েছিলাম। দুপুরে লাঞ্চ ব্রেকে উনি বললেন “আমি কল্যাণ সেনগুপ্ত, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের জোনাল অফিসে রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট দেখি। তোমাকে মিটিঙের পর জোনাল অফিসে নিয়ে যাব”।

খুব দিলদরিয়া বিন্দাস মানুষ ছিলেন কল্যাণবাবু। আমাকে বললেন “স্যার স্যার করিস না। কল্যাণদা ডাকবি”। উনি ইতিমধ্যে আমাকে তুই সম্বোধন শুরু করেছিলেন। লাঞ্চের পর মিটিং কিছুটা হালকা হয়ে গিয়েছিল। আর একটা জিনিস দেখে আশ্চর্য হলাম, সরকারি মহলে উনার পরিচিতি। কল্যাণদা দীর্ঘ সময় কলকাতা জোনাল অফিসের আরডি দপ্তর দেখতেন। পরবর্তী কালে উনি জলপাইগুড়ি এলে আমার বাড়িতেও এসেছেন। একবার ডিসিসি মিটিঙে স্টেট লীড ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান উপস্থিত হয়েছিলেন। কল্যাণদা এলেন এবং অবিশ্বাস্য দক্ষতায় সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

বেশ কিছুদিন পরের কথা, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী জনার্দন পূজারী সাহেব জলপাইগুড়িতে ঋণ মেলায় এসেছিলেন। কেন্দ্রে কংগ্রেসী সরকার আর রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার। আমরা জানতাম রাজ্য সরকার খুব একটা সহযোগিতা করবে

না। এই মেলার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন সাংসদ শ্রী দেবপ্রসাদ রায় (মিঠু)। ওর সঙ্গে আমার ছাত্রজীবন থেকেই গভীর বন্ধুত্ব। জলপাইগুড়ি জেলা তখন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কোচবিহার রিজিওন ভুক্ত ছিল। ওখানে রিজিওনাল ম্যানেজার ছিলেন জে.জে. ভট্টাচার্য সাহেব। তাঁর কথায় একটু সিলেটের টান ছিল। শুধুমাত্র দক্ষতার জোরে তিনি দ্রুত ওদের মুম্বাই অফিসে জেনারেল ম্যানেজারের পদ লাভ করেছিলেন। ঋণ মেলার কয়েকদিন আগে তৎকালীন লীড ব্যাঙ্ক অফিসার দেবব্রত (দেবুদা) ঘোষের বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। উনি বাধ্য হলেন ছুটি নিতে। উনি বলে গেলেন মেলার আগেই চলে আসবেন। টাস্ক বুঝিয়ে গিয়েছিলেন।

বর্তমানে ডাউকিমারিহাট ব্রাঞ্চের কৃষি ঋণের পোর্টফোলিও আয়তনে বিশাল। আর আছে হাজারের বেশি স্বনির্ভর দলের অ্যাকাউন্ট। এ জন্য শাখাটি কয়েকবার রাজ্য সরকারের দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছে।

মেলা নিয়ে ঘনঘন মিটিঙ হচ্ছিল জলপাইগুড়ি ক্লাবে। মিঠুর সহযোগীরা, ভট্টাচার্য সাহেব, আমি ও অন্যান্য ব্যাঙ্কের আধিকারিক দু-এক জন শলা পরামর্শ চালাচ্ছিলাম। ওঁরা বেশ কিছু তালিকা দিয়ে তাদের ঋণ মঞ্জুর করতে বলেছিলেন। আমরা যতটা সম্ভব আই.আর.ডি.পি., এস.সি.পি. প্রকল্পের সাহায্য নিয়ে এগিয়েছিলাম। আমাদের ব্যাঙ্কের তৎকালীন কর্তা আনির্দিষ্ট কালের ছুটি নিয়ে হাওয়া। তরোয়ালহীন এক ছোট কর্তা তখন ব্যাঙ্কে ছিলেন। তাকে জে.জে. ভট্টাচার্য সাহেব বলেছিলেন লোন মেলার সময় আশপাশে আসার দরকার নেই। তখন আমাদের ব্যাঙ্কের মনোজ, বিকাশ, দিলীপ, নির্মল, বুড়াই ও আরও অনেকে নানাভাবে সাহায্য করেছিল। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে স্যাংশান লেটার আসছে, যাদের হাতে পাম্পসেট, পাওয়ার টিলার, সেলাই মেশিন, রিক্সা ইত্যাদি তুলে দেওয়া হবে তাদের তালিকা ঠিক করার কাজ, গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ছোট্ট অফিসে চলছিল।

তখন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের জোনাল ম্যানেজার কানন মুখার্জী সাহেব। মেলার বেশ আগেই দেবুদা চলে এলেন। অনেকটা ভার মুক্ত হওয়া গেল। এর মাঝে স্টল ও প্যান্ডেল তৈরির কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। ফেস্টুন, ব্যাজ, ফুলের বোকে ইত্যাদি কলকাতা থেকে এসেছিল। জেলা শাসক ছিলেন সুনীল মিত্র মশায়। উনি বলেছিলেন সেদিন জরুরি কাজে বাইরে থাকবেন, তবে সকালে একবার অনুষ্ঠানস্থল ঘুরে যাবেন। সরকারি প্রকল্পের ঋণ ছাড়াও বহু মানুষ সরাসরি ব্যাঙ্ক ঋণ পেয়েছিল। গ্রামে অবশ্য একটা কথা ছড়িয়েছিল— 'পূজারী লোন' শোধ না করলেও চলবে।

কলকাতার সাহেবরা অনেকেই মেলার আগের দিন শিলিগুড়ি এসে ওখানেই হোটেল আশ্রয় নিয়েছিলেন। মন্ত্রীর বিশ্রামের জন্য তখনকার জলপাইগুড়ির ওই ছোট্ট সার্কিট হাউসেই ব্যবস্থা হয়েছিল। মনে আছে পূজারীজী ইংরাজীতে ভাষণ দিয়েছিলেন আর দক্ষতার সাথে দোভাষীর কাজ করেছিল মিঠু নিজেই। মূল মঞ্চে দেবুদা ও আমি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলাম। আর মঞ্চে ছিলেন ভিআইপি-রা। সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান শেষ হয়েছিল। রাতে দেবুদার অফিসে ফিরে সবাই মিলে শুকনো টোস্ট আর চা খেয়ে অপার তৃপ্তি পেয়েছিলাম।

১৯৮০ সনের ২৩শে জুন দিল্লিতে বিমান দুর্ঘটনায় ইন্দিরাজীর পুত্র কংগ্রেস নেতা সঞ্জয় গান্ধী মারা যান। যতদূর মনে পড়ে ওই দিন দুর্ঘটনার ঘণ্টাখানেক আগেই আমাদের প্রেমেরডাঙ্গা শাখার উদ্বোধন হয়েছিল। পরদিন ছিল ডাউকিমারিহাট ব্রাঞ্চের উদ্বোধন। প্রদীপ কুমার দাস সাহেব বললেন "ডাউকিমারির উদ্বোধন আগামীকাল বন্ধ রাখুন। ঝামেলার দরকার নেই, সাত দিন পরে ব্রাঞ্চ খোলা যাবে"। আমি বলেছিলাম "আমরা গিয়ে তো দেখি"। একটা আটার মিল সংলগ্ন ঘর সাময়িকভাবে উদ্বোধনের জন্য ঠিক করা হয়েছিল। শাখার দায়িত্বে বীরেনদা (বীরেন্দ্র নারায়ন রায়) ক্যাশের দায়িত্বে অরবিন্দ (বাপি) সিদ্ধান্ত। পরদিন ২৪ জুন সকাল আটটার কিছু আগে কোচবিহার থেকে বেরিয়ে সাড়ে

ন'টার সময় ডাউকিমারি পৌঁছলাম। এলাকার প্রধান এবং স্থানীয় স্কুলের হেড মাস্টার মশায়রা উদ্বোধনের পক্ষেই ছিলেন। বেশ কিছু যুবক ক্রমাগত দাবি করছিল অনুষ্ঠান বন্ধ করতে। বীরেনদা একটু নার্ভাস কিন্তু বাপি বলেছিল "ওই যুবকদের সঙ্গে কথা বলে দেখতে"। ও নিজেও আমার পাশে সেদিন ছিল।

দাস সাহেব আমার উপর স্পষ্টতই বিরক্ত। আমি যুবকদের ডেকে বলেছিলাম "আজ আমরা কোনও অনুষ্ঠান বা উৎসব পালনে আসি নি। কর্তব্য পালনে এসেছি। সঞ্জয়জী কর্মযোগী ছিলেন। আমরা উনার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নীরবতা পালন করে, শুধুমাত্র ব্রাঞ্চের দরজাটাই খুলে দেব।" যাইহোক শেষ পর্যন্ত অনাড়ম্বর উদ্বোধনের কাজটি সম্পন্ন হয়েছিল। নম নম করে কয়েকটি অ্যাকাউন্ট খোলা হল। বর্তমানে ওই ব্রাঞ্চের কৃষি ঋণের পোর্টফোলিও আয়তনে বিশাল। আর আছে হাজারের বেশি স্বনির্ভর দলের অ্যাকাউন্ট। এ জন্য শাখাটি কয়েকবার রাজ্য সরকারের দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছে। বীরেনদা চার বছর আগে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। উনি সহজ, সরল মানুষ ছিলেন। সুযোগ পেলে বীরেনদাকে নিয়ে লেখার ইচ্ছের রইল। সদা হাস্যময় মানুষটি আমাদের মনে ভাস্বর হয়ে আছেন।

আর একটা ব্রাঞ্চ উদ্বোধনের সময় ঝামেলা হয়েছিল। শিলিগুড়ির রথখোলা শাখার জন্য রথখোলাতেই একটা বাড়ি পছন্দ করা হয়েছিল। শাখার জন্য আসবাব পত্র, ফর্মস ও স্টেশনারি সব রেডি। স্টাফরা রিপোর্ট করেছেন, মেসেঞ্জার পদের জন্য নির্বাচন সারা। এমন সময় বাড়িওয়ালা দু-চার জনকে নিয়ে দাবি জানালেন মেসেঞ্জার পদে উনাদের এলাকার লোক নিযুক্ত করতে হবে। ওঁরা অবস্থানে অনড় থাকলেন। ব্যাঙ্ক, ওখানে ব্রাঞ্চ উদ্বোধনের সিদ্ধান্ত বাতিল করেছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও প্রশাসনকে ঘটনা জানানো হল। পরে ওই লাইসেন্সেই সুভাষপল্লীতে রথখোলা শাখার উদ্বোধন করা হয়েছিল।

অবশেষে জয়ন্ত রায় (অপু) ওই শাখায় মেসেঞ্জার পদে যোগদান করে। শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ারের অপু একজন কর্মকর্তা ছিল। ধীরে ধীরে তার চাকরি জীবনে পদোন্নতি হয়েছিল। অফিসার পদ থেকে ও অবসর গ্রহণ করে। বহু লড়াই আন্দোলনের সাথী ছিল অপু। ওর বাবা ও আমার লালকাকা বন্ধু ছিলেন। অপুদের শিলিগুড়ি বাড়িতে গেলেই ওর বাবা নানা গল্প করতেন। সামাজিক দায়িত্ববোধ ছিল প্রখর। কয়েকদিন আগে অপু পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে, রেখে গেছে পর্বতপ্রমাণ স্মৃতি।

আমাদের কাছে কুমারগ্রাম ব্লকের খোয়ারডাঙ্গা সেন্টারে শাখা খোলার লাইসেন্স ছিল। অত্যন্ত প্রান্তিক গ্রাম পঞ্চায়েত। বড় রাস্তা থেকে অনেকটা ভেতরে। সরাসরি যাতায়াত করার বাস প্রায় ছিলই না। দুই-একটা রিক্সা চলত, দিনের বেলা ডাকাতি হলেও বাঁচানোর কেউ ছিল না। বাড়ি ভাড়া পেতে সমস্যা ছিল। রেমিটেন্স আনা-নেওয়াও সমস্যা তৈরি করত। পরে দেখলাম সেখানে স্টেট ব্যাঙ্ক শাখা খুলেছিল।

একবার খবর এল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কামাখ্যাগুড়ি শাখার ম্যানেজারকে ঘিরে কিছু স্থানীয় মানুষ তর্কাতর্কির পর তাঁর উপর চড়াও হয়েছিল। তিনি শারীরিক ও মানসিক ভাবে আহত হয়েছিলেন। খবর পেয়ে কামাখ্যাগুড়ি ছুটে যাই। গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। পরে উভয় পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সভাপতি দক্ষতার সাথে সামলে নিয়েছিলেন। সেদিন ফেরার পথে খোয়ারডাঙ্গা গিয়ে স্টেট ব্যাঙ্কের শাখা দেখে চমকে গেলাম। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক যেখানে পরিকাঠামো জনিত কারণে শাখা খোলেনি সেখানে স্টেট ব্যাঙ্ক শাখা খোলায় আশ্চর্য হয়েছিলাম। তবে সেদিন স্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজারবাবু শাখাটির দুরবস্থার কথা বলতে গিয়ে প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন।

আলিপুরদুয়ার জংশনের কাছে দমনপুর শাখার জন্যও আমাদের লাইসেন্স ছিল। বাড়ি ঠিক করা হয়েছিল। রেল কর্তৃপক্ষ জানাল "এসব বাড়ি বেআইনি। আমাদের অনুমতি ছাড়া আমাদের জমিতে কীভাবে আপনারা ব্রাঞ্চ খুলছেন?"। অনেক অনুনয়েও চিঁড়ে ভিজল না। শাখা উদ্বোধন ওখানে বাতিল হয়েছিল। অনেক পরে ইউকো ব্যাঙ্ক দমনপুরে শাখা খুলেছিল। এই শাখা উদ্বোধন নিয়েই কত গল্প জমা আছে।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

বাংলার বারাণসী বড়নগর

জাহির রায়হান

নবাবি আমলে বাংলার ভূতপূর্ব প্রায় সকল জমিদার ও অভিজাত বর্গীয়দের সাময়িক বসবাসের উপযোগী একটি করে আবাস ছিল রাজধানী মুর্শিদাবাদ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে। নবাবি আনুকুল্যে রাজধানীতে এসে বসবাস করতেন জ্ঞানীগুণী এবং সমাজের উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিরা। আবার ব্যবসা-বাণিজ্যের পসার এবং সম্ভাবনার কারণে বণিকশ্রেণীও নির্মাণ করতেন তাঁদের প্রয়োজনীয় বাসস্থান। নাটোর রাজবংশের গঙ্গাবাস ছিল ভাগিরথীর পশ্চিম পাড়ে বটনগর বা বড়নগর। স্থানটি আজিমগঞ্জ থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আলোচ্য বড়নগর, নাটোরের রানি ভবানীর স্মৃতি ও অতুলনীয় কীর্তি।

সে কালের বিখ্যাত নাটোর রাজবংশের আদি পুরুষ ছিলেন রঘুনন্দন। তিনি কর্মরত ছিলেন পুটিয়ার রাজ দরবারে। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ'র (১৭১৭-১৭২৭) আমলে তাঁর আগমন ঘটে মুর্শিদাবাদে। তিনি নিয়োজিত হন নবাব নাজিমের নায়েব। কঠোর পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তার জোরে প্রভূত সম্পদ ও জমিদারির মালিক হন রঘুনন্দন। পরবর্তী সময়ে মুর্শিদাবাদের জমিদারি এবং নাটোরের জমিদারির মালিক হয় রঘুনন্দনের সহোদর ভাই রামজীবন। রামজীবনের পর তাঁর পুত্র কালিকাপ্রসাদ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন জমিদারি। তবে রামজীবন পুত্র

চারবাংলা মন্দির

ভবানীশ্বর মন্দির

কালিকাপ্রসাদ ছিলেন নিঃসন্তান। তাই তিনি দত্তক সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেন জনৈক রামকান্ত'কে। পিতার মৃত্যুর পর সমুদয় জমিদারির মালিকানা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন দত্তকপুত্র রামকান্ত। রানি ভবানী ছিলেন জমিদার রামকান্তের সুযোগ্য সহধর্মিনী।

যতদূর জানা যায়, রাজশাহী জেলার অন্তঃপাতি ছাতিম গ্রামের আত্মারাম চৌধুরী ও জয়দুর্গা দেবীর কন্যা রানি ভবানী। জমিদার রমাকান্ত ও রানি ভবানীর একমাত্র সন্তানের নাম তারাসুন্দরী এবং রামকৃষ্ণ ছিলেন তাঁদের দত্তক পুত্র। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের মতে ১৭৪৬ সালে মারা যান নাটোরের রাজা রামকান্ত। তাঁর অবর্তমানে জমিদারির হাল ধরেন তাঁর বিধবা স্ত্রী ধার্মিক ও প্রজাবৎসল রানি ভবানী। কথিত আছে সেই সময় শুধু নাটোর জমিদারি হতেই প্রতি বছর আদায় হত প্রায় দেড় কোটি টাকার রাজস্ব। রানি ভবানীর আমলে জমিদারি সেরেস্তার তাবৎ কাজ শুরু হয় বড়নগরে।

রানি ভবানী বড়নগর'কে কাশীর প্রতিরূপ রূপে

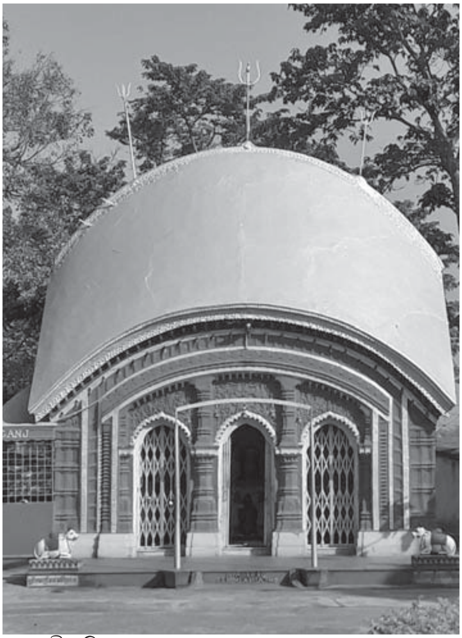

পঞ্চমুখী মন্দির

কথিত আছে উত্তরপ্রদেশের কাশী অর্থাৎ বর্তমান বারাণসী'তেও ভবানীশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রানি ভবানী। এই দুটি মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়কাল একই বলে জনশ্রুতি।

গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করেন বাংলার মানুষ। 'বাংলার বারাণসী' করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি বড়নগরে নির্মাণ করেন শতাধিক মন্দির। স্থানীয় মানুষ এখনও বিশ্বাস করেন যে বড়নগর ও সন্নিহিত অঞ্চলে এক রাতের মধ্যে ১০৮টি শিব মন্দির নির্মাণের নির্দেশ দেন তিনি। তবে বর্তমান সময়ে দেখভাল ও সংস্কারের অভাবে মন্দিরগুলির অধিকাংশই বিলুপ্ত। তারই মধ্যে কালের অভিঘাতকে পাশ কাটিয়ে এখনও কোনওক্রমে টিকে আছে জোড়বাংলার গঙ্গেশ্বর, গোপালেশ্বর, রাজ রাজেশ্বরী, ভবানীশ্বর, চারবাংলা ও পঞ্চমুখীর মত সামান্য কয়েকটি দেব মন্দির। চারবাংলা ও জোড়বাংলা মন্দির গাত্রে আজও দৃশ্যমান টেরাকোটার অপূর্ব দৃষ্টিনন্দন শিল্পকর্ম। এখানকার দেবালয়গুলিতে পরিলক্ষিত হয় খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতকের দেউল থেকে উনিশ শতকের দোল মঞ্চ শৈলী, পাশাপাশি লক্ষিত হয় বাংলার নিজস্ব মন্দির শৈলীর বিবর্তনের ধারা ও তার সমাপ্তি লগ্নের বৈশিষ্ট্য। মন্দিরগুলির নির্মাণকাল অষ্টাদশ শতক।

রানি ভবানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবালয়গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হল চারটি একচালা বাংলা মন্দির যা 'চার-বাংলা' মন্দির নামে সর্বজনবিদিত। বাংলার মন্দির শৈলীতে অবয়ব বা মন্দিরের সংখ্যা বোঝাতে 'বাংলা' শব্দটি ব্যবহৃত হয় বলে অনেকের ধারণা। যেমন 'একবাংলা' অর্থে একটি মন্দির, 'জোড়বাংলা' অর্থে এক সাথে দুটি মন্দির, তেমনি 'চারবাংলা' অর্থে একই সাথে চারটি মন্দিরের সমাহার। বস্তুত বাংলায় এমন চারবাংলা শৈলীর মন্দিরের নিদর্শন বিশেষ দেখা যায় না। ইঁটের ওপর খোদাই করা দশাবতার, দশ মহাবিদ্যা, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ইত্যাদি রূপটান মন্দির গাত্রে সৃষ্টি করেছে কালজয়ী শিল্পকলা। পশ্চিমবঙ্গ পুরাতত্ত্ব বিভাগের ফলক জানায় চারবাংলা মন্দির নির্মিত হয়েছে ১৭৫৫ সালে।

ভূমি থেকে কিছুটা উঁচু চাতালের উপর অবস্থিত চার দিকে চারটি মন্দির নিয়ে গঠিত হয়েছে চারবাংলা মন্দির। সব কয়টি মন্দিরই 'দো-চালা' অর্থাৎ দু'টি ঢাল ছাদ বিশিষ্ট। প্রত্যেকটি পৃথক মন্দিরে তিনটি করে দরজা এবং প্রতিটিতে তিনটি করে মোট বারোটি শিবলিঙ্গের অধিষ্ঠান। মন্দিরগুলির টেরাকোটার অলংকরণ লক্ষ্য করলে বোঝা যায় রামায়ণ, মহাভারতসহ নানান পৌরাণিক আখ্যান স্থান পেয়েছে মন্দিরের দেওয়ালে দেওয়ালে। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী, দশাবতার, শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ, শিকার, শোভাযাত্রা, হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি পোড়ামাটির সুনিপুণ কার্যরীতির মাধ্যমে হয়ে উঠেছে জীবন্ত। পূর্ব দিকের মন্দিরের কারুকার্য চুন নির্মিত। পশ্চিমদিকের মন্দিরে লঙ্কাযুদ্ধ

রাজ রাজেশ্বরী মন্দির

ও দেবীযুদ্ধের বর্ণনা। দক্ষিণমুখী মন্দিরের শিল্পকাজ বর্তমানে ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন। যদিও মন্দিরটি নিপুণ কারুশিল্পের নিদর্শন। ভাস্কর্যের মধ্যে রয়েছে রামলীলা ও কৃষ্ণলীলার খোদাই চিত্র। শিকার ও শোভাযাত্রার দৃশ্যরূপও রয়েছে সেখানে। তিনটি তোরণের উপরে অসুরনাশিনী চণ্ডী, রাম-রাবণের যুদ্ধ, কৃষ্ণের কংসবধ প্রভৃতি দৃশ্যের অবতারণাও উল্লেখযোগ্য। কালী, চণ্ডী ও অন্যান্য দেবদেবী ছাড়াও দেখা মেলে যোগাসনে উপবিষ্ট শিবমূর্তির। তবে দক্ষিণ দিকের উত্তরমুখী মন্দিরটি কারুকার্য বিহীন। চারবাংলা মন্দিরের পাশ দিয়েই দক্ষিণ দিকে বহমান পুণ্যসলিলা গঙ্গা।

চারবাংলা মন্দিরের পিছন দিকে কিছুটা উত্তরে রয়েছে সুউচ্চ ভবানীশ্বর মন্দির। যেখানে পূজিত হন ভগবান শিব। বড়নগরের মন্দিরগুলির মধ্যে ভবানীশ্বর মন্দিরটিই সর্বাপেক্ষা উচ্চতম। অষ্টকোণ বিশিষ্ট গম্বুজাকৃতি মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৬০ ফুট। মন্দিরের মাথায় আট পাপড়িযুক্ত পদ্মের অবস্থান। ছাদের উপর একটি বৃহৎ গম্বুজের স্থাপনা যা একরত্ন গঠনের সাথে তুলনীয়। মন্দিরের প্রবেশদ্বার আটখানি। কথিত আছে উত্তরপ্রদেশের কাশী অর্থাৎ বর্তমান বারাণসী'তেও ভবানীশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রানি ভবানী। এই দুটি মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়কাল একই বলে জনশ্রুতি।

অলিন্দযুক্ত ভাস্কর্যময় ভবানীশ্বর মন্দিরটির পাশেই রয়েছে অষ্টধাতু নির্মিত মহিষমর্দিনী দুর্গার রাজরাজেশ্বরীর মূর্তি। অপূর্ব তার কারুকাজ, অলংকরণ সমৃদ্ধ, রণসম্ভারে সজ্জিতা এমন প্রতিমা চোখে পড়ে না সচরাচর। রাজরাজেশ্বরী ছাড়াও সেখানে রয়েছেন বিষ্ণু, জয়দুর্গা, মহালক্ষ্মী, মদনগোপাল প্রমুখ দেব-দেবী। রানি ভবানীর দত্তকপুত্র সাধক রামকৃষ্ণের পঞ্চমুণ্ডের আসনের স্থানটি এখানেই স্থাপিত। অদূরেই রানি ভবানী কন্যা তারাসুন্দরী নির্মিত গোপাল মন্দিরটি আজ জীর্ণ। গঙ্গেশ্বর, কস্তুরীশ্বর, নাগেশ্বর শিব মন্দিরের অবস্থাও ভালো নয়।

বড়নগরের সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির চারচালা গঠনের রামেশ্বর মন্দির (স্থাপিত ১৭৪১ খ্রিস্টাব্দ) বর্তমানে প্রায় পরিত্যক্ত। কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, দশাবতার, সপ্তমাতৃকা, নন্দীপৃষ্ঠে শিব, গরুড়পৃষ্ঠে বিষ্ণু, সপরিবারে দুর্গা ইত্যাদি ভাস্কর্যে সজ্জিত। চার-বাংলা মন্দিরের দক্ষিণে রয়েছে আঞ্চলিক লোকদেবতা পঞ্চাননরূপী শিবের আলাদা একটি এক-বাংলা মন্দির যা পঞ্চমুখী শিবমন্দির নামে পরিচিত। নিয়মিত সংস্কারের কারণে মন্দিরটি এখনও অটুট অবস্থায় দণ্ডায়মান। মন্দিরটির সামগ্রিক পরিবেশ অত্যন্ত মনোহর।

আনকোরা ডুয়ার্সে
নদীতে পা দিলেই ভুটান !

প্রতাপ কুমার মণ্ডল

'ভুটানের বর্ডার তাহলে কোনটা?'

প্রশ্নটা করাতেই একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠলেন ভদ্রলোক। 'আরে, বর্ডার কী বলছেন? ওই দেখুন, ওই যে ওই গেটের তালাটা যখন খুলে দেব, আপনারা নদীতে পা দিলেন। ব্যস, ওটাই তো ভুটান। বিকেলে নদী পার হওয়ার সময় দেখবেন, লোহার বিম পুঁতে সীমানা করা আছে।'

'বাঃ, রিসর্টের দেওয়ালের ওপারেই ভুটান সীমান্ত। ডুয়ার্সে এটাই বোধহয় কোনও আন্তর্জাতিক সীমান্তের সবচেয়ে কাছের ট্যুরিস্ট স্পট।' স্বগক্তোতিতে সোচ্চার হলাম উচ্ছাসে।

'এটা ঠিক বলেছেন' —এই বলে আমাদের দেখভালের তদারকিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ভদ্রলোক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ট্যুরিজম বিভাগের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গে 'এক্সপিরিয়েন্স বেঙ্গল'-এর নতুন প্রকল্প চামুর্চি ইকো-রিসর্টে দাঁড়িয়ে রিসর্ট ম্যানেজারের সাথে চলছিল এমনই কথোপকথন।

ডুয়ার্সের এই নতুন গন্তব্যে বেড়ানোর খোঁজ পেয়ে দল বেঁধে যাওয়াই ঠিক হল। কত আর ঘরে বসে থাকা যায়! একমত হয়ে সকলে এক বুধবার শিয়ালদা থেকে রাতের ট্রেনে চেপে পরদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ মাল জংশনে নেমে পড়লাম।

তিনটে সুমোতে হৈ হৈ করে রওনা দিলাম প্রায় ৪৫ কিমি দূরের চামুর্চির দিকে।

উত্তরবঙ্গের যে কোনও স্টেশনে নেমে মালপত্র গাড়িতে তুলে হাইওয়ে দিয়ে ছুটতে শুরু করলেই, মনটা ভালো হয়ে যায়। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। ৩১ সি জাতীয় সড়ক ধরে চালসা, খুনিয়া প্রভৃতি চেনা জায়গাগুলো পার হচ্ছি এক-এক করে। নেওড়া জলঢাকা মূর্তি ডায়না প্রিয় নদীগুলি পেরিয়ে গেল। তারপর বাগরাকোট পার করে বানারহাটের আগে গাড়ি একটা শর্টকাট ধরল। শুরু হল আমাদের সবুজের অভিযান। চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে কালো পিচরাস্তা। চা গাছের ফাঁকে রেইন ট্রি-র নজরদারি। সুদীর্ঘ পথ অজগর সাপের মত এঁকেবেঁকে চলে গেছে। কোথাও আবার রাস্তার পাশাপাশি একটু দূর দিয়ে চলেছে ট্রেন-লাইন। বেশ কয়েকটা চা-বাগান পেরিয়ে পৌঁছলাম ছোট্ট গঞ্জ আমবাড়ি। আমবাড়ি মোড় থেকে ঢুকে সাকুল্যে প্রায় এক ঘণ্টা পর চামুর্চি বাজার এল।

চামুর্চির বাজার এলাকা বেশ জমজমাট। অনেকগুলো দোকান, সবজি ও মাছবাজার, মিষ্টি ও চায়ের দোকান, মোবাইল স্টোর, ইংরাজি স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র কী নেই সেখানে! ব্যস্ত জনপদে নেপালী, ভুটিয়া শ্রেণীর পাহাড়ি মানুষের সংখ্যাই বেশি। বাজার পেরিয়ে আধা পাথুরে রাস্তা ধরে চলেছে গাড়ি। চুনাভাট্টিতে তাসি চোলিং গুম্ফাকে ডানদিকে রেখে চা

বাগানের পাশ কাটিয়ে পথ। এল এক বিশাল প্রান্তর— তার ঢাল উঠে গেছে উপরের দিকে। ঢাল ধরে পৌঁছে গেলাম এক নদীর পাড়ে।

সুকৃতি নদী— অল্প জলের ধারা, চওড়া রিভার-বেড। গাড়িগুলো পরপর সেই জলের উপর দিয়ে বালির চর পেরিয়ে উল্টোদিকের পাড়ে উঠল। কিছুটা এগিয়ে একটা ছোট্ট সিমেন্টের কালভার্ট পেরিয়ে ডানদিকে ঘুরতেই চোখে পড়ল পার্কের ওয়েলকাম-গেট। গাড়ি নিয়ে গেট পেরিয়ে আমরা চামুর্চি ইকো-ট্যুরিজম পার্কের অন্দরে ঢুকে সোজা রিসেপশনে। তিনদিক ভুটান-পাহাড়ে ঘেরা প্রকৃতির কোলে, জঙ্গুলে সবুজ আর জোড়া নদীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পৌঁছে গেলাম। নীল আকাশ এমনভাবে মাথার উপর নেমে এসেছে, যেন দুহাত দিয়ে আগলে রেখেছে সে তার আঙিনায় গড়ে ওঠা নতুন ভ্রমণকেন্দ্রটিকে। ভৌগোলিক অবস্থানে এই জায়গা পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে। রাজ্য পর্যটন বিভাগের সহায়তায় বছর কয়েক আগে থেকে এখানে ট্যুরিজম মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

কালচে সবুজ পাহাড়ের পেক্ষাপটে চা-বাগান, নদী আর পাহাড় ঘেরা ট্যুরিস্ট রিসর্টের অবস্থানটি অতুলনীয়। সামনে তার পাঁচিলঘেরা সুদীর্ঘ ঘাসের লন। তার মধ্যে দিয়ে রঙ্গীন টালির পায়ে চলা রাস্তাগুলো খুশিমত চলে গেছে এদিক-সেদিক। মাঝেমাঝে নানা রঙের সিমেন্টের ছাতার নিচে বাঁধানো বসার জায়গা। সেখানে রিসর্টের লোকজন ছাড়াও স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে বাইক-আরোহী প্রেমিক-প্রেমিকাদের একচেটিয়া অধিকার। পার্কের মাঝখানে উঁচু নজর মিনার— পাখির চোখে দেখে নেওয়া যায় পাহাড়ি উপত্যকায় দুয়ারপানি নদীর চালচলনে ছটফটানি। বিশাল ডরমিটরি সহ দুটো দোতলা বাড়ি নিয়ে রিসর্টে সাকুল্যে ঘর মোট আটটি। অতিথি আপ্যায়নের জন্য আছে আলাদা বড় ডাইনিং হল সহযোগে জব্বর ব্যবস্থাপনা।

বাংলার আঙিনা থেকে ড্রাগনের দেশ ভুটানে ঢোকার আঠেরোটি গেটের অন্যতম চামুর্চি, ডুয়ার্সের ট্যুরিজম মানচিত্রে নতুন চিন্তার ফসল। নৈঃশব্দের আবহে পরিবেশ ও প্রকৃতির টানে অবসর যাপনে আসতে পারেন অবশ্যই। আর বেড়াতে এসে যারা রোমাঞ্চ খুঁজে বেড়ান তারা তো খুশিই হবেন। রিসর্টের নদী প্রান্তের গেট পেরিয়ে হাঁটু জলে নদী পার হয়ে হাঁটা পথে জঙ্গলের ভিতর পাঁচ কিমি দূরত্বে পাহাড়ের পাদদেশে মহাকাল দেখে নেওয়া যায়। মহাকালের অদূরে 'মিউজিকাল স্টোন কেভ'। পাহাড়ের ভিতরে জোরে আওয়াজ করলে শব্দের সুন্দর অনুরণন ভরিয়ে তোলে পথশ্রমের ক্লান্তি। চামুর্চি থেকে গারুচিরা, কালাপানি, রোহিতি প্রভৃতি স্থানে ঘুরলে সেই অঞ্চলের মানুষের নিস্তরঙ্গ জনজীবন চোখে পড়বে।

ডুয়ার্সে প্রকৃতির বিচিত্র রূপের সৌন্দর্য অনুভূত হয় চামুর্চির পথে প্রান্তরে। একদিন রিসর্টের বারান্দায় বসে দেখছি, পাহাড়ের মাথায় জড়ো হওয়া

ধূসর-কালো মেঘের দল হঠাৎ কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল। উত্তরে বাতাস বইছিল জোরে। বাতাসের তাড়া খেয়ে মেঘেরা পাহাড়ের দিক থেকে ধেয়ে এল নদীর দিকে। তার একটু পরেই কালো মেঘ বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ল নদীর বুকে। ক্রমে সেই বৃষ্টি নদী পেরিয়ে রিসর্ট ও তার আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ল মুষলধারে। রিসর্টে বসে বৃষ্টি আসার দৃশ্য উপভোগের অনুভূতি লিখে বোঝানো দুষ্কর। শুধু মন অনুভব করে তা নিজের মত করে। একটু পরে বৃষ্টি থামল। ভাঙা মেঘের মধ্যে দিয়ে উঁকি দিল সূর্য। রোদ উঠল ঝলমলিয়ে। আমরাও রিসর্টের পিছনের নদী পেরিয়ে বেরিয়ে পড়লাম চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে গ্রামের অন্দরে। স্থানীয় মানুষদের সাথে আলাপ ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাঝে তাসি-চোলিং গোম্পা দেখা হল। নানা রঙের বাড়িতে লাগানো 'উইশিং ফ্ল্যাগ' হাওয়ায় উড়ছে। পরিচ্ছন্ন এলাকার মধ্যে দিয়ে হাঁটাপথে বড় রাস্তায় পৌঁছলাম। প্রকৃতি এখানে দূষণমুক্ত— চকচকে পিচরাস্তা সোজা চলে গেছে ভুটানের অন্য চেকপোস্টে। বড় রাস্তার মোড়ে চা-মিষ্টির দোকানে জমে উঠল আড্ডা।

পরদিন ইকো রিসর্টের প্রধান ফটক থেকে বেরিয়ে ডান হাতি পথ ধরে ভুটান সীমান্তের দিকে চলেছি। এখানে সীমান্তে কোনও কাঁটাতারের বেড়া নেই। নেই এপার-ওপারের হাজারো বিধিনিষেধের কড়াকড়িও। দুধারে সবুজ ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে কাঁচাপাকা রাস্তা। পাহাড় থেকে নেমে আসা অবিরাম জলস্রোত জমির আলের পাশ দিয়ে এসে, রাস্তা ভিজিয়ে বয়ে চলেছে নিচের নাবাল জমিতে। মাঝেমাঝে ওই স্রোতে জাল বিছিয়ে মাছ ধরছে গাঁয়ের ছেলেবুড়ো মিলে। সেখান থেকে এগোলে, ডানদিকে সুপারি গাছে ঘেরা কাঠ পাথরে গড়া ধ্বংসপ্রায় রাজবাড়ি চোখে পড়বে। কথিত, উত্তরবঙ্গের এক রাজপরিবার গ্রীষ্মকালে এখানে নদী পাহাড়ের সান্নিধ্যে ছুটি উপভোগ করতেন। স্বাধীনতা উত্তর পর্বে সরকারি হস্তক্ষেপে রাজত্ব হারানোর নিয়মে আজ সে রাজবাড়ি বিপন্ন, উপেক্ষিত।

ঐতিহ্যের স্মৃতি ক্যামেরা বন্দী করে এসে পড়লাম ভুটানের সামসে (সামচি)-র তাসিজং গ্রামে। এখানে সার বেঁধে ডলোমাইট কারখানাতে মেশিনে ডলোমাইট ভাঙা ও সরবরাহের কাজ চলছে। এখানে লক্ষণীয় যে শ্রমিকেরা অধিকাংশই বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে এসে কাজ করছে। এ গ্রামের বাড়িঘর, দোকানপাটে ব্যবহৃত ভাষা ও চিহ্নে ভুটানি রাজতন্ত্রের সংকেত। বাড়ি লাগোয়া ছোট্ট দোকানঘরে রোজকার খাবার দাবার ও অন্যান্য টুকিটাকি জিনিসের সাথে স্থানীয় ও বিদেশী মদও পাওয়া যায়। মানুষেরা মিশুকে ও অতিথিবৎসল। দু'দেশের সীমান্ত অঞ্চল হওয়ায় চামুর্চিতে গড়ে ওঠা ইকো ট্যুরিজম ক্ষেত্রে চালু রয়েছে এক মিশ্র সংস্কৃতির জীবনধারা। উত্তরবঙ্গের পাহাড় আর ডুয়ার্সের সমতল এখানে মিলেমিশে একাকার।

পরিবর্তনের রীতি মেনে পৃথিবী ও প্রকৃতি পাল্টে যাচ্ছে প্রতিদিনই। ফলে প্রথাগত ভ্রমণ ভাবনা পাল্টে গেছে ইকো-ট্যুরিজমে। ইকো ট্যুরিজম পরিকাঠামোতে নদী, পাহাড়, অরণ্য নিয়ে চামুর্চির মত ভ্রমণ গন্তব্য ডুয়ার্স ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও নেই। সারা বছর দারুণভাবে উপভোগ্য হলেও বর্ষায় বৃষ্টিস্নাতা চামুর্চির অনন্য রূপ দেখার মত। অবসর বিনোদন বা উইক-এন্ডে চিরকালীন সৌন্দর্য দেখতে অনায়াসে এখানে আসা যায়। ডুয়ার্স বলেই অদূর ভবিষ্যতে চামুর্চি হয়ে উঠবে এক জনপ্রিয় ভ্রমণ কেন্দ্র সন্দেহ নেই।

বাংলার আঙিনা থেকে ড্রাগনের দেশ ভুটানে ঢোকার আঠেরোটি গেটের অন্যতম চামুর্চি, ডুয়ার্সের ট্যুরিজম মানচিত্রে নতুন চিন্তার ফসল। নৈঃশব্দের আবহে পরিবেশ ও প্রকৃতির টানে অবসর যাপনে আসতে পারেন অবশ্যই।

থাকার সেরা জায়গা 'চামুর্চি ইকো রিসর্ট'। অনেক ঘর ছাড়াও ডর্মিটরি আছে।

যোগাযোগ— ৯১ ৯৮৩০৫-০৮০০৯ অথবা
ই মেল— chamurchiecoresort@gmail.com

ধারাবাহিক উপন্যাস। দ্বাদশ পর্ব

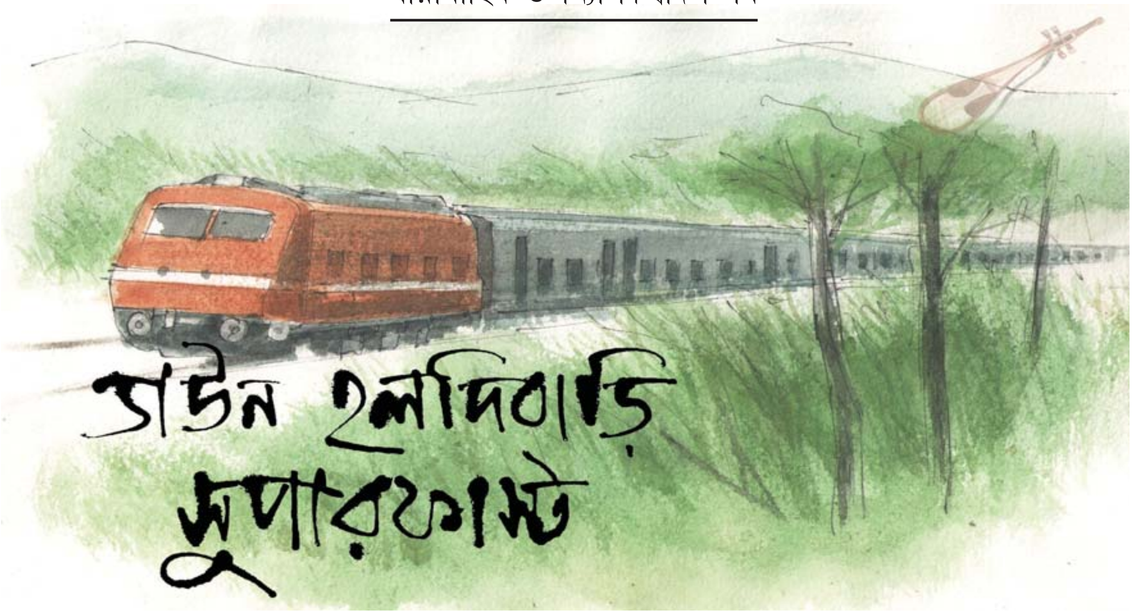

সুজিত দাস

কুণ্ডুর হেফাজতে আছে দশজন মেয়ে। ভগবানের রান্না করা বোরোলি মাছের চাহিদা বিপুল। প্রশান্ত করের বৃহস্পতি তুঙ্গে। খবরিলাল-এর ব্রেকিং স্টোরি আসছে। চিকা বিশু দাঁড়াচ্ছে ভোটে। বুলেট পঞ্চার হাতে আবার অনেক কবি। ঘটনার ঘনঘটায় বিচিত্র পথে চলছে হলদিবাড়ি সুপার ফাস্ট। এর মধ্যেই ঘুমের রেশ থেকে ছিটকে উঠল সৌরভ। হরেন কুণ্ডু ফোন করেছে উকিলকে। তারপর?

২৩

'সেক্স, ভগবান, সেক্স। যৌনতা বড়ই সিরিয়াস প্লট রে', সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে তারক ব্যানার্জি চোখের পাতা খুলে ভগবানের দিকে তাকায়।

'আপনে বললেন যখন আলবৎ ঠিক। এক্কেবারে ঠিক। তা এই বিত্তান্তে ওসব কথা আসে কী করে তারকদা?', ভগবানের বিস্ময় আর কাটতেই চায় না।

'আসে রে, আসে। বুঝবি নদী আর সেক্স হল জুড়ুয়া ভাই। কখন কোথায় কীভাবে বইবে ভগবানও জানে না, তো তুই আর আমি কোন ছার?'

'একটু বড় কইরা গুছায় কন, তারকদা।'

'গোছগাছের কিছু নাই রে, পৃথিবীর সব জায়গায়

সেক্স একরকম। ইস্তাম্বুল থেকে ইটাহার যৌনতার একটাই ভাষা। বোঝোস?'

'বুঝি খানিকটা, তবে আমি একটু লাটা আছি, জানেনই তো। আরো বিশদে কন তারক-দা', ভগবান পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে থাকে।

'বুঝিস তুই গোটাটাই। আসলে শোনার ইচ্ছেটা বড় চাগাড় দিচ্ছে মনে হয়। অবিবাহিত লোকেরা অনেকেই বেশি বয়েসে একটু রসস্থ হয়ে ওঠে। তোর কেসটাও খানিকটা ওই রকম।'

'এই না, না, তারকদা, তেমন কিছু না। আপনারে একটু বেশিই জিগাই ফেললাম। চা খাবেন দাদা?', লজ্জা পেয়ে বলে ওঠে ভগবান।

'দোকান তো মাসখানেকের মধ্যেই বেশ দাঁড় করিয়ে ফেলেছিস তুই।'

'সবই আপনের দান, দাদা। জমিও আপনে দিলেন, টাকাও দিলেন কতটা। আমার তো সামান্য টাকা কিছু লাগিয়েছি, সারাজীবন বেহালা বাজিয়ে পেটটাই চলল শুধু। না হল একটা থাকার জায়গা, না জমল টাকা। তবে সকলেই একডাকে চেনে, ভালোবাসে, এটাও কি কম, কন দাদা?'

'শোন ভগবান, জমি আমার, টাকাও খানিকটা আমার কিন্তু তুই শ্রম দিস তাই লাভ আধাআধি।'

'তারকদা, আমার মাথার ওপরে ছাদ হইছে দোকানের লগে লগেই। পাটনার বানাইয়েন না দাদা বরং মাসে মাসে হাত খরচের জন্য কিছু দিলেই হবে।'

'না, তুই আমার অর্ধেকের পার্টনার। দিস ইজ গ্রহ ভগবান, গ্রহের ফের। তুই সৎ, পরিশ্রমী মানুষ। আমি মনসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি দোকান দাঁড়িয়ে গেছে। তা ছাড়া জমিটা তো আমার পড়েই ছিল। তুই ধাবা খুলেছিস। মাঝে মধ্যে আসি এখানে। মানুষজন দেখি, খুব ভালো লাগে। বয়স হলে কথা বলার জন কমে যায় আস্তে আস্তে', চায়ে চুমুক দিয়ে জমিয়ে বসেন তারক ব্যানার্জি, 'মধুপুরে মানুষের হাতে টাকা আসছে, ভগবান।'

'তো?'

'তো এই যে গো-শালা মোড়ে তোর এই ধাবা রমরম করবে কিছুদিনের মধ্যে। লাইন ট্রাক, রোড স্টেশনের প্যাসেঞ্জার এমনকী মধুপুরের মানুষজনও খাবার নিয়ে যাবে এখান থেকে। টেক অ্যাওয়ে বুঝিস? টেক অ্যাওয়ে?'

'না তারকদা, তবে বিষয়টা খানিক মাথার মধ্যে ভিনে যাচ্ছে।'

'শোন ভগবান, জিভ আর লিঙ্গের ওপর মানুষের শাসনটা একটু আলগা। আর তোর রান্নার যা হাতযশ, আমি সিওর 'ভগবানের ধাবা, প্রোঃ শ্রী ভগবান চন্দ্র দাস' এই টিনের সাইনবোর্ডটা আর কয়েকমাসেই

'শোন, মেঝেতে টাইলস্ হয়, কমোডে হাগা হয়, মাদারিহাটের সেগুন কাঠের বিছানা হয় কিন্তু বউ বুড়ি হয়। বুঝলি?'
'অনেকটা অনুমান করতে পারলাম যেন।'
'এই সময়টায় নোলা সক্‌সক্ করতে শুরু করে। মোবাইলের ছবির ভঙ্গিতে করতে ইচ্ছা করে। লাল নীল সব পার্টির লোকেরাই কুণ্ডুর কাস্টমার ছিল।

গ্লো-সাইন বোর্ডে লেখা হবে। এই চাটাইয়ের বেড়া তুই বদলে দিবি ভগবান। তবে বেহালা বাজানো তুই কখনও ছাড়িস না, পয়সা হলে লোকে শেকড় ভুলে যায়। তুই কিন্তু সুরটা ভুলিস না। ওটা তোর রক্তে।'

'তবে তারকদা, এই যে বললেন জিভ আর লিঙ্গের ওপর মানুষের কন্ট্রোল নাই, এইডা কিন্তু হক কথা', ভগবান পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে আসে।

'সেক্স ব্রাদার, সেক্স। হরেন কুণ্ডু এতটা ওপরে উঠল কী করে? বেশিরভাগ নেতাই বিড়ি থেকে শুরু করে কিংসাইজে পৌঁছায়, ভাড়ার বাড়ি থেকে দুই-তিন

মহলা বাড়ি, মাঠে হাগত যারা সবাই কমোডে বসে এখন। এই সময়েই আসল চুলকানিটা শুরু হয়।'

'বুঝাইয়া কন, দাদা, বুঝাইয়া কন।'

'শোন, মেঝেতে টাইলস্ হয়, কমোডে হাগা হয়, মাদারিহাটের সেগুন কাঠের বিছানা হয় কিন্তু বউ বুড়ি হয়। বুঝলি?'

'অনেকটা অনুমান করতে পারলাম যেন।'

'এই সময়টায় নোলা সক্সক্ করতে শুরু করে। মোবাইলের ছবির ভঙ্গিতে করতে ইচ্ছা করে। লাল নীল সব পার্টির লোকেরাই কুণ্ডুর কাস্টমার ছিল। কুণ্ডু ইনভেস্ট করেছিল রিটার্নও পেয়েছিল অনেকগুণ। কিন্তু ওই লোভ, সব দিকে হাত মারতে গেল। এখন তো পালিয়ে বেড়াচ্ছে।'

'এখন তো ঝাঁপ বন্ধ।'

'তাই কি, ভগবান? খবর কিন্তু অন্যরকম।'

'কন কি তারকদা, মানে?'

'মানে মাটিয়ালি আর সামসিং বাজারের হোমস্টেগুলো কয়েকদিন বন্ধ ছিল এখন আবার চালু। কিছু মেয়ে ডুয়ার্সের বাকিরা ইমপোর্টেড। এরা খেপ খেলতে আসে।'

'উরিব্বাস, কন কী দাদা!'

'হ্যাঁ, এদের এসকর্ট বলে, হাই প্রোফাইল কল গার্ল। মালদার পার্টির ডিমান্ড থাকলে কুণ্ডুর আড়কাঠিরা কলকাতায় খবর করে। মোবাইলে ক্যাটালগ চলে আসে। তারপর কাস্টমারের মনোমত মেয়ে বাগডোগরা হয়ে সোজা আমাদের এখানে। দু'রাতে তিরিশ চল্লিশ হাজার।'

'অ্যাঁ, চল্লিইইইইশ!'

'হ্যাঁ, তার মধ্যে কুণ্ডুর কমিশন দশ, পনেরো। চিন্তা কর লোকটা ভ্যানিশ কিন্তু ওর এই কারবারটা চলছে ঠিকঠাক।'

'নাভির নিচেই যত গণ্ডগোল, তারকদা।'

'সব গ্রহ রে ভগবান, গ্রহের ফের। তবে কয়েকদিনের মধ্যেই অ্যাকশন হবে। তোরও অনেক কাজ আছে। তোকে কেউ সন্দেহ করবে না।'

'যা বলবেন তারকদা।'

'শোন, লোকাল মেয়েগুলোকে একদিনে এখান থেকে বের করতে হবে। প্রায় দশজন এমন মেয়ে কুণ্ডুর হেফাজতে আছে। সাবিত্রী ওদের সঙ্গে খুব গোপনে যোগাযোগ করেছে, এদেরকে এখান থেকে খুব সাবধানে তুলে নিয়ে তিনটে গাড়িতে করে তোকে নিয়ে যেতে হবে।'

'কোথায় তারকদা?'

'সিকিমে। সুমন লামার একটা 'হোম' আছে, সেইখানে। ডিটেল প্ল্যান ট্রিপল আর, মংরা আর মিলনজী জানিয়ে দেবেন কাল পরশু। এখন একপ্লেট মাংস খাওয়া সঙ্গে দুটো রুটি। তোর এখানকার রান্নার সুনাম এখন ছড়িয়ে পড়েছে বানারহাট থেকে সুলকাপাড়া, তেলিপারা থেকে বেলাকোবা অবধি। গন্ধেই আমার অর্ধেক ভোজন হয়ে গেল।'

'ক্রিস্টাল জিন আনিয়ে দিই পাশের পানের দোকান থেকে?'

'এখনও ভুটান মদ চলছে?'

'হ্যাঁ, দাদা। খুব কম আর লুকাছাপা করে। নাগরাকাটার বেনারসী প্রসাদ চালাচ্ছে। জিতি বর্ডার দিয়ে।'

'দে তবে। যদিও জিন আমি খাই না, ওটা মেয়েছেলেদের মদ। পা ফাঁক করার আগে খায় মেমরা।'

'বিদেশে শুনেছি মেয়েছেলেরা এমনি এমনিই নিজের ইচ্ছাতেই পা ফাঁক করে, এখানকার মত হুর-হ্যাট করে না?'

'আরে তবু মুড বানানোর একটা ব্যাপার আছে না? ওই মুড আনার জনই মেমসাহেবরা জিন খায়।' 'কত জানেন দাদা, আপনি', ভগবান নিজের অজ্ঞতায় নিজেই লজ্জা পায়।

বড় স্বাদের রান্না করে ভগবান। নিজেই গ্রামগঞ্জ ঘুরে ঘুরে দেশি মুরগি কেনে। এখন গ্রামের লোকেরাই দিয়ে যাচ্ছে। এক একটা মুরগিকে চার টুকরো করে বেশ কষিয়ে রাঁধে। মাপের থেকে একটু বেশি তেল মশলা। একটু বাঙাল ধাঁচ। তবে স্বাদের তুলনা নেই। রুটির ওপর হালকা ঘিয়ের প্রলেপ। একটা ছোট্ট বাটিতে সামান্য ডল্লে খুরসানির চাটনি। মানুষটার সুরের ওপর দখল আছে এটাই সবাই জানে কিন্তু রান্নার ভেতরেও লঙ্কা হলুদ জিরের এমন তারসপ্তক! এই ধাবার সামনে এখন থেকেই ডুয়ার্স বেড়াতে

যাওয়া ট্যুরিস্ট গাড়ি থামতে চলেছে। আইটেমগুলোও রোজ নিজে কেনে ভগবান, অল্প পরিমাণে। দোমহানি থেকে সকাল বিকাল মিলে তিন কেজি বোরোলি মাছ রান্না হয়। না ভেজে, তেলঝাল। আর মধুপুর শহরের লোকেরা এই মাছের জন্য পাগল। ইদানীং ট্যুরিস্টরাও এই মাছের খোঁজ করে। একপ্লেট মাছের দাম দেড়শো টাকা শুনে কলকাতার বাবুরা 'ড্যাঞ্চি, ড্যাঞ্চি' বলে হেসে ওঠেন। তবে ভগবান লোককে ঠকায় না, খুব সামান্য লাভ রাখে। গরীবগুর্বো আর ড্রাইভারদের জন্যও সস্তায় খুব ভালো মেনু রেখেছে ও। ঝাঝাঙ্গির ধাবা থেকে বহু কাস্টমার এখন ভগবানের কাছে আসছে।

ক্রিস্টাল জিন হালকা কাজ করছে মাথার ভেতরে। তারক ভাবতে থাকে এই মেয়ে ব্যবসার শেষ হওয়া দরকার। গরীব কিছু মেয়েকে এই কাজে লাগিয়েছে যারা তারা নরপিশাচের থেকেও অধম। শুধু নির্দেশের অপেক্ষা এখন। তাছাড়া অনেক যুবক ছেলে যারা ছোট ছোট হোমস্টে বানিয়ে সৎভাবে ব্যবসা করতে চেয়েছিল এই অঞ্চলে ওরা এদের সঙ্গে পেরে উঠছে না। মাটিয়ালির মানুষ এদেরকে সহ্য করতে পারে না। একদিন বিস্ফোরণ হবেই। শুধু একটা স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষা।

'রান্না ঠিক আছে, তারকদা?', মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করে ভগবান।

'শোন ভগবান, আমার দাদু একটা কথা বলত, প্যাট আর চ্যাঁটের জ্বলন এড়ানো খুব মুশকিল। তুই মানুষের জিভের মধ্যে দিয়েও মন জয় করবি আবার। যেমন এতদিন তোর বেহালার সুর দিয়ে সবাইকে জিতে নিয়েছিস। তেমন করেই।'

প্রশান্ত করের বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে।

হাতে টাকা, লিভাইসের জিন্স, ফ্যাব ইন্ডিয়ার জহর কোট, জে ডবল্যু ম্যারিয়টের কফি, ফেসবুকে গভীর রাতের চ্যাট। প্রশান্তর এখন জীবন জি বাংলা, লাইফ ঝিঙ্গালালা। তবে গতকাল বাটা সুভাষের ফোনটা পাওয়া ইস্তক মনটা গার্ডেন গার্ডেন লাগছে। আজকে সেই অভিসার। দুপুর থেকেই উত্তেজিত লাগছে প্রশান্তর। একটা গোটা মেয়ের সঙ্গে বন্ধ ঘরের ভেতর! উফফ্, ভাবতেই ভালো লাগে। কয়েকবার বগলে ডিও স্প্রে করে ফেলেছে এর মধ্যেই। একটু বাদেই সুমন লামার বাড়ি যাবে সিটি অটো রিজার্ভ করে। আজ ওর কাজটা একই সঙ্গে কব্জিতে বেলফুল বাঁধা বাবু এবং রিপোর্টারের। গতকালই ফোনে ঠাণ্ডা গলায় হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে সুভাষদা,

'কোনও বাড়াবাড়ি নয়, তুমি ওখানে মেয়েদের রেস্কিউ অভিযানের একটা অংশ, বিছানায় উঠবে না।'

এমন একটা কাজের দায়িত্ব পেয়েছে প্রশান্ত

ঘরটা ছোট এবং কাঠের দেওয়াল। প্রশান্তর সামনে একটি বছর কুড়ির মেয়ে। পরনে হট প্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জির মতো টপ। মেয়েটি জানে কেন এসেছে প্রশান্ত। এখন এভাবেই মিনিট কুড়ি সময় নষ্ট করতে হবে। ততক্ষণে বাকি মেয়েরা সুপারিবাগানের পাশে দাঁড়ানো তিনটে আলো নেভানো গাড়িতে উঠে বসবে। এই সময়টুকু প্রশান্ত গম্ভীর মুখে বসে থাকে। মেয়েটি ফিচেল হাসিতে মাপে প্রশান্তকে

যেখানে রসগোল্লা পলিপ্যাকের ভেতর এবং প্যাকেট খোলা যাবে না। তবে বাটা সুভাষের কথাই হুকুম। আর প্রশান্ত জানে হাকিম নড়ে উঠতে পারে কিন্তু হুকুম নড়ে না।

এই সুমন লামা আরেকটা লোক। হাসি মুখ, সবসময় রিল্যাক্সড, এত পয়সা কিন্তু কোনও অহংকার নেই তবে সামনে গিয়ে দাঁড়ালে নিজেকে একটা

মিনিয়েচার ফর্ম-এর পুতুল মানুষ বলে মনে হয়। শালুগাড়া অটোস্ট্যান্ডে নেমে চুলটা আর একবার আঁচড়ে নিয়ে সুমনের প্যাগোডা স্টাইলের বাড়িটায় ঢোকে প্রশান্ত। নিচের তলায় সার সার দামি গাড়ি, রেসিং কার। এসব টপকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠে। লিভিং রুমটা বেশ বড়। প্রশান্তকে গমগমে গলায় অভ্যর্থনা জানায় সুমন,

'আরে, প্রশান্ত্‌ভাই, এতি দিন বাদ! আও আও, তাতো চিয়া খাও। অনি সবই হাল খবর ঠিকঠাক?'

সুমনের বাড়িতে এই আরেক জ্বালা। পাতলা গ্রিন টি বিচ্ছিরি লাগে প্রশান্তর। তবু খুব অভ্যস্ত, এমন একটা সোনামুখ করে চায়ের কাপে ঠোঁট ছোঁয়ায় প্রশান্ত কর।

ঘরটা ছোট এবং কাঠের দেওয়াল। প্রশান্তর সামনে একটি বছর কুড়ির মেয়ে। পরনে হট প্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জির মতো টপ। মেয়েটি জানে কেন এসেছে প্রশান্ত। সাবিত্রীদি আগেই ফোনে পেমা আন্টিকে সব বলে রেখেছে। ঘরে কাস্টমার থাকলে প্রধান দাজু পাহারায় থাকে। লাল চোখ, দৈত্যের মত চেহারা। এখন এভাবেই মিনিট কুড়ি সময় নষ্ট করতে হবে। ততক্ষণে বাকি মেয়েরা সুপারিবাগানের পাশে দাঁড়ানো তিনটে আলো নেভানো গাড়িতে উঠে বসবে। এই সময়টুকু প্রশান্ত গম্ভীর মুখে বসে থাকে। মেয়েটি ফিচেল হাসিতে মাপে প্রশান্তকে,

'কি সাহাব, প্রথমবার কোনও রেন্ডির ঘরে এলে নাকি, এত ঘামছ?'

সত্যিই প্রশান্ত ঘেমে নেয়ে একাকার। জহর কোট অবধি ঘেমে উঠেছে। মেয়েটি খুব মজা পাচ্ছে প্রশান্তকে এই অবস্থায় দেখে,

'চল, হয়েই যাক, প্রথমবারে কেউ পাঁচ মিনিটের বেশি থাকতে পারে না। এপাং ওপাং ঝপাং হয়ে যায়, হি হি হি।'

'থামো, এখন ফাজলামির সময় নয়', জহরকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কোনওক্রমে বলে প্রশান্ত।

আধঘণ্টা বাদে দরজায় টোকা দেয় প্রধান দাজু। দরজা খোলবার আগেই প্রধানের আর্ত চিৎকারে কেঁপে ওঠে সন্ধের মাটিয়ালি বাজার। দূর থেকে ভেসে আসা ছট্‌পুজোর আওয়াজে মিলিয়ে যায় সেই আর্তনাদ। গুলিগোলা হবে প্রশান্ত ভাবে নি আগে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বেরিয়ে আসে। পেছনে ফিচেল হাসির সেই মেয়েটি। সুপারি বাগানের পাশ থেকে চতুর মার্জারের মতো এসে থামে একটি কালো গাড়ি। সুমন লামা মুহূর্তের জন্য স্লো করলেই প্রশান্ত এবং মেয়েটি গাড়িতে ওঠে। আগের তিনটে গাড়িতে মেয়েদের সঙ্গে সাবিত্রি এবং শুক্রা। দুটো গাড়িতেই মিলন গোম্বুর পাঠানো দু'জন করে প্লেইন ক্লোদ পুলিশ। সুমন লামা গাড়ি চালায় বিদ্যুতের গতিতে। চালসা মোড়ে এসেই আগের গাড়িগুলোকে ধরে ফেলে।

সন্ধে এর মধ্যেই গাঢ় হয়ে এসেছে। তিনটে গাড়ি বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে লাটাগুড়ির জঙ্গল চিরে এগিয়ে চলছে। এমনটাই হওয়ার কথা, প্রধান দাজুকে আহত করাটা স্ক্রিপ্টেই ছিল। লোকটা নৃশংস এবং কুণ্ডুর হেঞ্চম্যান। এরপর তিনটে হোমস্টেতে আগুন জ্বলে ওঠে। এলাকাটাকে টেরোরাইজ করার জন্য শূন্যে প্রচুর গুলি চালায় 'ফুটবলার'রা। মাটিয়ালি বাজার থেকে কেউই এগিয়ে আসে নি। এই হোমস্টেগুলোর ওপর এলাকার মানুষজনের প্রচুর ক্ষোভ ছিল। কুণ্ডু আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে যাওয়ার পর সবাই ভেবেছিল কারবার বন্ধ হবে কিন্তু কয়েকদিন বাদে আবার যে কে সেই!

ছট্‌পুজোর জন্য ভগবানের ধাবা আজ আর কাল, এই দু'দিন বন্ধ।

পাহাড়পুর মোড়ের আড্ডাবাজেরা এতক্ষণে বাড়ি ফিরে গেছে। ধাবা বন্ধ থাকায় চা, রুটি তরকাও বন্ধ তাই ঠেকগুলো তাড়াতাড়িই শেষ হয়েছে আজ। ভগবান আর তারক ব্যানার্জি ভেতরের ঘরে বসে ছটফট করছে। কোনও ফোন করা যাবে না, এমনটাই নির্দেশ সুমন লামা আর সুভাষের। বেশ খানিকক্ষণ বাদে ধাবার পেছনে সুমনের কালো গাড়িটা এসে থামে। কিছুক্ষণ পর পর আরও দুটো গাড়ি। ধাবার পেছনের কমপাউন্ডটা চাটাই-এর বেড়া দিয়ে ঘেরা।

একবার গাড়িগুলো ঢুকে যাওয়ার পর বাইরে থেকে আর দেখার কোনও উপায় নেই।

প্রশান্ত ওই সময়টুকুর মধ্যেই যে ক'টা সম্ভব ফটো তুলে নিয়েছিল। এখন 'সিগনাল'-এ দাউদাউ আগুনে জ্বলতে থাকার কয়েকটা ছবি মাটিয়ালির লোকাল সোর্স থেকে পেয়ে যাওয়ার পর 'খবরিলাল' এ বেশ জমিয়ে একটা স্টোরি দাঁড় করাচ্ছে। মেয়েগুলোর ছবিও ক্লিপ করে জুড়ে দেয় নিউজটার সঙ্গে। মুখগুলো যদিও ব্লার করা। গোটা খবরটাই নিজস্ব সংবাদদাতার নামে লেখে। এতক্ষণে ফেসবুকে ছবি আসতে শুরু করেছে। এইবার প্রশান্ত নিজের পোর্টাল থেকে নিউজটা এয়ার করে। এখন ভালো হালচাল শুরু হবে। পুলিশের মুভমেন্ট চলবে আজ সারারাত। কাল ভোরের দিকে মেয়েগুলোকে নিয়ে ইয়াকসামের দিকে রওয়ানা দেবে সুমন লামা। ওর ডেস্টিটিউট হোমে, 'দ্য হরাইজন'। আজকের রাতটা এইখানেই থাকতে হবে এবং সাবধানে।

'খবরিলাল' এই নিউজের শেষে কয়েকটা ইনপুট যোগ করে এবং এটা পরিষ্কার করে দেয় যে কুণ্ডুর অনুপস্থিতিতেও ওর হয়ে কাজ করার লোক প্রশাসন এবং পার্টিতে কিছু কম পড়ে নি। তবে কে বা কারা কোন উদ্দেশ্যে এই অগ্নিসংযোগ এবং গুলিগোলা চালালো সেই নিয়ে প্রশাসনের কর্তাদের কাছে এখনও কোনও ঠোস খবর নেই।

২৪

শিলিগুড়ি শহরটার একটা গতি আছে। স্পিড, স্পিড।

পাশের মধুপুর শহরের মত গজেন্দ্রগমনে দিন কাটে না এখানে। জীবন এখানে দ্রুতগামী। হিলকার্ট রোডের চায়ের দোকানগুলো খুলে যায় কাকভোরে। এরপর হংকং মার্কেটের ডালাওয়ালারা হাঁকডাক শুরু করে। বিধান মার্কেট জমে ওঠে সাতটা থেকেই। সন্ধে হতে না হতেই শহরের হোটেল রেস্তোরাঁগুলোতে ভিড়। অনেক জনগোষ্ঠীকে নিয়ে শিলিগুড়ি একটা কসমোপলিটান শহর। খুব দ্রুত তার পালস্ বিট।

একসময়ের সিল্ক রুট হিলকার্ট রোডকে কেন্দ্র করে এই শহর তার ব্যাসার্ধ এঁকেছে। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে ক্রমে ক্রমে করপোরেশন স্তরে উঠে গেছে তরাই-এর এই জনপদ। আগের মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনেই টের পাওয়া গিয়েছিল শহুরে মানুষের মধ্যে জনসমর্থন ক্রমশ কমে আসছে রুলিং পার্টির। শহর চালায় তিন পার্টির তিনজন নেতা। জনান্তিকে লোকে তাঁদের 'অমর-আকবর-অ্যান্টনি' বলে ডাকে। বাইরে আকচাআকচি থাকলেও ভেতরে নাকি তিনজনই এক, একাকার। তবে অমর ভটচাজের পার্টি টের পেয়েছিল মিউনিসিপ্যালিটিকে টিঁকিয়ে রাখতে হলে কিছু গ্রামীণ এলাকা অ্যাড করতে হবে। সেই রকমই এক অ্যাডেড

চিকা বিশু দীনবন্ধু মঞ্চ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অর্গানাইজেশনের নামে টানা বুক করে রেখেছে। প্রায় রোজই কোনও না কোনও অনুষ্ঠান লেগে আছে। প্রতিদিনই ৫৪নং ওয়ার্ড থেকে কেউ না কেউ প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করছে। অনেক কবির ভিড়ে ডেইলি ওই ওয়ার্ড থেকে যাতে অন্তত নতুন জনা পনেরো কবি কবিতা পড়ে সেটা এনসিওর করার দায়িত্ব বুলেট পঞ্চার।

এরিয়া থেকে ভোটে দাঁড়িয়েছে চিকা বিশু অ্যালিয়াস শ্রী বিশ্বজিৎ পাল। ভোটে দাঁড়ানোর পর থেকে অনেক ভেক বদলেছে চিকা। জিন্স-টিশার্ট বাতিল করে পাঞ্জাবি-পায়জামায় শিফট করেছে, পায়ের স্নিকার খুলে কুয়োভাদিসের চপ্পল। 'বার'-এ গিয়ে মদ খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছে আজকাল। গুটকা তো একদম বাদ। সবচেয়ে বিপদ ৫৪নং ওয়ার্ডের কবি-সাহিত্যিকের দল। শালা, গোটা শহরের

সমোস্কিতি এই ওয়ার্ডে এসেই জুটেছে। প্রথম লিফলেটে অজস্র বানান ভুল ছিল। সেই নিয়ে ব্যাপক খিল্লি হয়েছে ফেসবুকে। বুলেট পঞ্চা দুটো কবিকে রেখেছে তারপর থেকে। লিফলেট, পোস্টার, ব্যানার এইসব লেখা এবং প্রুফ দেখার জন্য। দুই কবিই সরেস মাল। লম্বা চুল, ভাসানো চোখ।

চিকা বিশু দীনবন্ধু মঞ্চ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অর্গানাইজেশনের নামে টানা বুক করে রেখেছে। প্রায় রোজই কোনও না কোনও অনুষ্ঠান লেগে আছে। প্রতিদিনই ৫৪নং ওয়ার্ড থেকে কেউ না কেউ প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করছে। অনেক কবির ভিড়ে ডেইলি ওই ওয়ার্ড থেকে যাতে অন্তত নতুন জনা পনেরো কবি কবিতা পড়ে সেটা এনসিওর করার দায়িত্ব বুলেট পঞ্চার। পঞ্চার এখন মন খুব খারাপ,

'চিকাদা, ওয়ার্ডে তো আর কবি নেই। স্টক প্রায় শেষ।'

'কেন, নতুন কবি বানা, প্রয়োজনে কবিতা সাপ্লাই দেওয়ার জন্য কয়েকজনকে লাগিয়ে রাখ। খর্চাপাতি নিয়ে ভাবিস না।'

'দাদা, কবিদের নিয়ে খর্চার কোনও চিন্তা নেই। হলভাড়া, টিপিন আর মাইক নিয়ে পাঁচের মধ্যেই রোজের অনুষ্ঠান নেমে যাচ্ছে। কিন্তু কবি যে রিপিট হয়ে যাচ্ছে।'

'হোক রিপিট, চেষ্টা কর নতুন মুখ আনার। কয়েকজনকে কবিতা লিখতে বসিয়ে দে। সাপ্লাই লাইনটা ভালো রাখ, মঞ্চে কবির অভাব হবে না। প্রত্যেকের ছবি তুলে পাঠিয়ে দিবি। আমাদের অরাজনৈতিক ব্যানার সহ। ওগুলোই ফেসবুকে পোস্ট হবে। যত পোস্ট, তত প্রচার।'

'একদম গুরু, লেগডাস্ট দিও।'

'বেশ, চালিয়ে যা। ডাইরেক পলিটিক্স রাখিস না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাতের কথা বলবি, ধর্ম মানিস না বলবি।'

'একদম দাদা, নতুন স্লোগান বানিয়েছে ওরা, আমার রক্ত, তোমার রক্ত/ একই রক্ত, একই রক্ত/ আমরা বিশু-দার চরম ভক্ত।'

'বাহ চমৎকার। সেমিনারও করবি মাঝে মাঝে। গোটা বাইশ অধ্যাপক আছে আমার ওয়ার্ডে। সবাইকে গাড়ি পাঠিয়ে আনবি। ফেরার সময় হলদিরামের বড় প্যাকেট দিবি। একটা অধ্যাপকের, দুটো বাড়ির জন্য।'

'চারজন অপোনেন্ট দলের মার্কামারা ক্যাডার দাদা। ওরা আসবে না। ছয়জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। সাতে পাঁচে থাকেন না। বাকি এগারো জন কথা দিয়েছে কিন্তু একটা পবলেম চিকাদা।'

'কী?'

'আলোচনা শোনার লোক থাকে না। ডেকোরেটর আর মাইকম্যান ছাড়া হল ফাঁকা।'

'ঠিক আছে, আমি প্রসেনজিতকে বলে দিচ্ছি। এন জে পি হকার ইউনিয়নের গোটা চল্লিশ ছেলে ডেইলি হাজিরায় বক্তৃতা শুনবে।'

'হকারগুলোর ওপর অত্যাচার হয়ে যাবে না দাদা?'

'সাড়ে পাঁচশো টাকা যে ছ্যাপ দিয়ে গুনে নেবে, তার বেলা?'

'বেশ দাদা, তাই হবে।'

'শোন কেবল চ্যানেলে সব লাইভ যাচ্ছে। কোথাও ঢিল দেওয়া যাবে না। টাকার চিন্তা তুই করিস না। অধ্যাপকদের একটা ইয়ে আছে জনমানসে, ওটা কাজে লাগাতে হবে। আর হ্যাঁ, রিটায়ার্ড অধ্যাপক খোঁজ, কাজ থাকে না ওঁদের তাই সব অনুষ্ঠানে একঘণ্টা আগেই এসে বসে থাকবে। মোটমাট সাংস্কৃতিক সব ভোট আমার চাই।'

ধীরেন বসুনিয়ার বাড়িতে একটা ছোট্ট যন্ত্রকে ঘিরে তিনজন মানুষ গতকাল সন্ধে থেকে একমনে বসে আছে। রাধারানি, মিলন গোম্বু আর দাত্তা সাহেব। হরেন কুণ্ডুর পাঁচটা মোবাইল নম্বরের খোঁজ পাওয়া গেছে। সঙ্গে কুণ্ডুর বাড়ির ল্যান্ডলাইন আরও গোটা দশেক ফোনকে ইন্টারসেপ্ট করার চেষ্টা চলছে। হরেনের পরিচিত নম্বর সব। সার্ভিস প্রোভাইডার থেকে পালিয়ে যাওয়ার আগে হরেনের কল লিস্ট দেখে দেখে এই নম্বরগুলো বেছে নেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত হরেনের গলা পাওয়া যায় নি তবে কাল মধ্যরাতে ভালো একটা লিড পাওয়া গেছে। তারপর থেকেই পালা করে জেগে আছে এই তিনজন।

'আজ-কালের মধ্যেই ব্রেক-থ্রু হবে, আই অ্যাম কোয়াইট সিওর', সৌরভ একটু টেনসড হলে সিগারেট খায়। এমনিতে খুব বেশি স্মোক করে না।

'হ্যাঁ, স্যর। মানুষ, যত বড় ক্রিমিনালই হোক না কেন পরিচিত লোকজনের সঙ্গে কথা না বলে বেশিদিন থাকতে পারে না', মিলনজী সায় দেন দাত্তাসাহেবের কথায়।

'মোটামুটি এটুকু বোঝা যাচ্ছে কুণ্ডু ডুয়ার্সেই আছে', রাধারানি যোগ করেন, 'আসলে ডুয়ার্স কুণ্ডুর কমফোর্ট জোন। খুব বিপদ না বুঝলে এই জায়গা ও ছেড়ে যাবে না।'

'তাছাড়া ম্যাডাম, এখানেই সব কনট্যাক্ট ওর। এখান থেকেই অপারেট করে ও চাইবে আগাম জামিনের ব্যবস্থা করতে।'

"হ্যাঁ, মিলনজী, এবং ওকে আমাদের ধরতে হবে। সেই ধরাটা খুব ল'ফুলি হবে না। ধরে ওর একটা স্টেটমেন্ট ভিডিও করতে হবে। তারপর তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে লোকাল পুলিশের হাতে। কোথাও কোনওভাবে আমাদের ট্রেস থাকবে না তবে 'দ্য ডেইলি এশিয়ান এজ'-এর পোর্টালে কুণ্ডুর স্বীকারোক্তি ছড়িয়ে দিতে হবে", এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো শেষ করেন ট্রিপল আর।

ভোর নাগাদ সৌরভের চোখ লেগে এসেছিল খানিকটা।

হঠাৎ বিপ বিপ শব্দে নিজের উপস্থিতি জানান দেয় যন্ত্র। কুণ্ডু এবারে নিজেই ফোন করেছে ওর উকিলকে। গোটা কথোপকথন হেডফোনে শুনে নিয়ে উল্লসিত হয়ে চিৎকার করে সৌরভ। পাশের দুটো ঘর থেকে ছুটে আসেন মিলন গোম্বু এবং রাধারানি।

'হোয়াট হ্যাপেনড স্যর?', উৎসুক মিলনজী হেডফোন পরে নেন মাথার ওপর দিয়ে।

'হেডফোনের দরকার নেই, মিলনজী। গোটা কনভার্সেশনটাই টেপ করা আছে।'

যা বোঝা গেল আজ দুপুরেই ময়নাগুড়িতে নিজের উকিলের সঙ্গে দেখা করবে হরেন কুণ্ডু। উকিলের খামারবাড়িতে।

'মিলনজী, ইটস দ্য মোমেন্ট নাউ। লেটস চক আউট দ্য প্রোগ্রাম', ছিলাটান ধনুকের মত উঠে দাঁড়ায় সৌরভ।

দোমহানি মোড় থেকে বাঁদিকে না ঢুকে সোজা বেরিয়ে গেছে যে বাইপাস রোড তার ধারেই একটি টাটা সুমো অনেকক্ষণ ধরে খারাপ হয়ে আছে। রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং-এর ঠিক আগে। বনেট তুলে নিয়ে ইঞ্জিন দেখছে ড্রাইভার। ভেতরে বসে থাকা একজন বার বার চেষ্টা করেও ইঞ্জিন স্টার্ট করতে পারছে না। প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ মিনিট হয়ে গেল তবু টাটা সুমো ভরাট গলায় হেসে উঠল না এখনও। গাড়ির ভেতরে বসে থাকা তিনজনের মধ্যে একজনের মোবাইল বেজে ওঠে। এবং তার পরে মিনিট খানেকের মধ্যেই স্টার্ট নিয়ে নেয় সুমো গাড়িটি। তবে রেলগেট পড়ে যাওয়ায় এখন আর আগুপিছু না করে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ধূসর রঙের এই চার চাকা।

চোখ বাঁধা হরেন কুণ্ডুকে দেখবার মত। মিলনজী জানেন থার্ড ডিগ্রি না প্রয়োগ করেও হিমশীতল আওয়াজে কীভাবে কথা বের করতে হয়। এবং আধঘণ্টার মধ্যেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা এক এক করে উগড়ে দেয় অনেকটা। আরাত্রিকা এবং বলবিন্দর বয়ান রেকর্ড করে।

উল্টোদিক দিক থেকে একটি বাইক এসে থামে রেলগেটের সামনে। টাটা সুমোর একটু পেছনে। বাইকার এবং পিলিয়নে বসে থাকা আরোহী, দুজনের মাথাতেই হেলমেট। সুমোর পেছনের দরজা খুলে যায় হঠাৎ। দুজন মানুষ পিলিয়নে বসে থাকা আরোহীকে তুলে নেয় অবলীলায়। বাঘ যেভাবে শিশু হরিণের গলা কামড়ে টেনে নিয়ে যায়, ঠিক সেই ভাবে। বাইকারের মাথার নিচে, ছোটা মগজ থাকে যেখানে,

সেখানে একটি আলতো রদ্দা মারে একজন। সার্জিকাল প্রিসিশনে। মোটরসাইকেল সমেত উলটে পড়ে চালক। টাটা সুমোর ড্রাইভার পলকের মধ্যে ইঞ্চি মেপে ঘুরিয়ে নেয় গাড়ি। গোটা ব্যাপারটার আয়ু মেরে কেটে দশ সেকেন্ড। আশপাশের লোকেরা কিছু বোঝার আগেই টাটা সুমো তিস্তা ব্রিজ পেরিয়ে মধুপুর শহরের স্টেডিয়াম পেরিয়ে ইলা ব্যানার্জির মধুকুঞ্জে। চোখ বাঁধা হরেন কুণ্ডু জেগে উঠবে একটু বাদেই। আপাতত মৃদু ডোজ ক্লোরোফর্ম কাজ করছে হরেনের মস্তিস্কে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই ধূসর টাটা সুমোটি বাইরে বেরিয়ে যায় নতুন নম্বর প্লেট সহ। এই ড্রাইভারকে আমরা চিনি। সুমন লামা। স্টিয়ারিং যার হাতে খেলা করে পোষা ল্যাব্রাডরের মত।

চোখ বাঁধা হরেন কুণ্ডুকে দেখবার মত।

মিলনজী জানেন থার্ড ডিগ্রি না প্রয়োগ করেও হিমশীতল আওয়াজে কীভাবে কথা বের করতে হয়। এবং আধঘণ্টার মধ্যেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা এক এক করে উগড়ে দেয় অনেকটা। আরাত্রিকা এবং বলবিন্দর বয়ান রেকর্ড করে। কুণ্ডু চোখ বাঁধা অবস্থায় বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকে,

'আপনারা কি পুলিশ?'

মিলন গোম্বু নিখুঁত বাংলা অ্যাকসেন্টে উত্তর দেন,

'না, আমাদের কোনও দায়িত্ব নেই তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার কিংবা কোর্টে প্রোডিউস করার। তোমার বেঁচে থাকাটা নির্ভর করবে সবটা বলার ওপর নইলে তিস্তায় আরেকটা দেহ ভেসে যাবে।'

হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করে হরেন কুণ্ডু।

এক এক করে নাম বলতে শুরু করে হরেন। কে নেই সেই লিস্টে! নিজের কালো ধান্দার সবটা উগড়ে দেয় কুণ্ডু। কলকাতার পলিটিকাল বস থেকে লোকাল পুলিশের ব্ল্যাক শিপ, সব নাম বলবিন্দরের ক্যামেরার সামনে এক এক করে বলতে থাকে কুণ্ডু।

হরেন কুণ্ডুর ভিডিও এই মুহূর্তে সব মোবাইলে ঘুরছে। মধুপুর থেকে কলকাতা, মানুষ চমকে উঠেছে এই স্বীকারোক্তি দেখে। অনেক নেতার মোবাইল সুইচড অফ। পুলিশ লাইন থেকে শুরু করে প্রশাসনিক ভবনে এক হিরণ্ময় নীরবতা।

এমত আবহে ভোর পাঁচটার সময় মধুপুর এবং শিলিগুড়ির সমস্ত লোকাল চ্যানেল আর পোর্টালগুলোতে একটি আননোন নম্বর থেকে মেসেজ গেল। এবং রিপোর্টাররা হরেন কুণ্ডুর অচেতন দেহ পড়ে থাকতে দেখল মধুপুর শহরের সার্ফ-এর মোড়ে। সবার আগে সেখানে পৌঁছেছিল এমন একজন যে তার নতুন মেরুন রঙের জহর কোটটা আজই প্রথম পরল। প্রশান্ত, প্রশান্ত কর।

সার্ফ-এর মোড়ে হাত-পা পিছমোড়া করে বাঁধা অচেতন হরেন কুণ্ডুকে ঘিরে একটি বড় ভিড় জমে উঠেছে এখন। ভিড়ের ভেতর থেকে ডাক্তার এবং কয়েকজন পুলিশ হরেনকে অ্যাম্বুল্যান্সে তুলছে। ছবি উঠছে পটাপট।

খানিক দূরে একটি পুলিশ জিপ দাঁড়িয়ে।

এই দু'জনকে আমরা চিনি। টাউন ডিএসপি এবং বড়বাবু।

'মিত্র, কিছু মনে পড়ছে তোমার?'

'হ্যাঁ, স্যর। প্যাটার্ন। গোছানো প্যাটার্ন। হরেন কুণ্ডুর কাছে আমরা পরে, সাংবাদিকরা আগে', আই সি মিত্রর তৎক্ষণাৎ জবাব।

'গুড মিত্র, নাউ ইউ হ্যাভ গট ইট। ভাগ্য ভালো তোমার নাম হরেন বলে নি।'

'আমরা স্যর লিস্টে অনেক পেছনে।'

'তালিকা অনেক লম্বা হবে, মিত্র। ডোন্ট গেট রিল্যাক্সড।'

'প্যাটার্ন, স্যর প্যাটার্ন।'

হরেনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই এস পি সাহেবের ফোন আসে টাউন ডিএসপির ফেসটাইমে।

'স্যর ....নো, স্যর, নাউ ইটস নট পসিব্ল টু এলিমিনেট হিম। ....নো ওয়ে, স্যর। আপনি যাই বলুন জীবনে প্রথমবার সুপিরিওর অফিসারের অর্ডার ডিসওবে করব। উর্দিতে দাগ লাগতে দেব না স্যর। রজার।'

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

খেলনা

অরণ্য মিত্র

১

সুদীপন বিশ্বাস দেখেছিলেন যে মোটর সাইকেলটা দ্রুতগতিতে ছুটে আসছে। তিনি ছেলের হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন রাস্তার কোনায়। মোটর সাইকেল হয় তো প্রচন্ড গতিতে, গ্রামের ছয় ফুট চওড়া রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে হু হু করে চলে যেত হাইরোডের দিকে। সে সাইকেল বেশ দামি। গোটা অঞ্চলে একটাই আছে এমন সাইকেল। সুদীপন বিশ্বাস শুনেছিলেন যে সে সাইকেলের দাম প্রায় লাখ তিনেক। দুরন্ত গতিতে ছুটে আসা সেই সাইকেলের দিকে তিনি আর তাঁর চার বছরের শিশুপুত্র তাকিয়ে ছিলেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে।

আচমকা সাইকেলের সামনে চলে এল মদন মোহন্তের গরু। হয় তো রাস্তার অপর প্রান্তে কোন সুখাদ্য চোখে পড়েছিল তার। তড়িঘড়ি রাস্তা পার হতে গিয়ে বেসামাল করে দিল মোটর সাইকেলটাকে। আরোহী বিশ্বজিৎ পাল গরুকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল প্রাণপণ। সে সফলও হয়েছিল। কিন্তু বিনিময়ে সুদীপন বিশ্বাসের শরীর ঘেঁসে বেরিয়ে যাওয়ার সময় উড়িয়ে নিয়ে গেল শিশুটিকে। প্রচন্ড ধাক্কায় প্রায় পনের ফুট দূরে ছিটকে পড়া শিশুটি নির্ঘাৎ শূন্যে ভেসে থাকা

অবস্থাতেই মারা গিয়েছিল। সেটা নিশ্চিত করল সদর হসপিটালের ডাক্তার।

সুদীপন বিশ্বাস বড় নিরীহ লোক। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। গলা তুলে কথা বলতে পারেন না। ছত্রিশ বছরের সুদীপন বিশ্বাস যখন বাবা হতে গিয়ে বউকে প্রায় হারাতে বসেছিলেন। বিস্তর লড়াই করে ডাক্তার মা সমেত শিশুর প্রাণ রক্ষা করার পর বলে দিয়েছিলেন যে বউ-এর পক্ষে আবার সন্তান ধারন করাটা হবে আত্মহত্যার সামিল। সুদীপন বিশ্বাসের বউ মহুয়া ক্ষীণকায়া তরুণী। স্বামীর মতই আত্মবিশ্বাসহীন, ঘোরতর ঈশ্বর বিশ্বাসী এবং নিরীহ। তাঁরা দু-জনেই

সোনালি ফিতেয় বাঁধা রঙিন কাগজে মোড়া বাক্সের ভেতর কী খেলনা আছে কেউ জানে না। প্রথমে ঠিক করা হল সেগুলো গ্রামের শিশুদের বিলিয়ে দেওয়া হবে।

ভেবেছিলেন যে একমাত্র সন্তানকে মনের মত করে মানুষ করবেন। শিশুর নামকরণ তাঁরা করেছিলেন দেবদীপ।

পাড়ার লোকেরা তো বটেই, গ্রামের লোকেরাও ভেবেছিল যে সন্তানের শোকে এই নিরীহ দম্পতি নির্ঘাৎ পাগল হয়ে যাবে। গোড়ায় তাঁদের দেখে এটা মনে হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু মাস দুয়েক পর দেখা গেল অসহনীয় শোকের কবল থেকে বেরিয়ে এসে সুদীপন বিশ্বাস আবার স্কুলে যোগ দিলেন। তাঁকে স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছিল।

কিন্তু পুরো স্বাভাবিক নয়।একটা অস্বাভাবিকতাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন তিনি। সপ্তাহে দু-তিন দিন তিনি স্কুল থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যেতেন সদর শহরে। সেখান থেকে ফিরতেন সন্ধে নাগাদ। তখন তাঁর হাতে থাকত রঙিন কাগজে মোড়া বাক্স। বাক্সের ভেতর খেলনা। বাড়ি ফিরে বাইরের ছোট ঘরে টেবিলের ওপর রাখা দেবদীপের ফোটোর সামনে খেলনার বাক্স নামিয়ে রেখে তিনি ফিসফিস করে কিছু বলতেন। তখন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকত মহুয়া। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলতেন যে সে দৃশ্য দেখে তাঁদের চোখে জল আসত।

কিন্তু এইটুকু অস্বাভাবিকতা বাদ দিলে সুদীপন-মহুয়াকে মনে হত স্বাভাবিক দম্পতি। মনে হত যেন তাঁরা শান্তিতেই আছে। প্রায় বছর খানেক এইভাবে নিয়মিত ছেলের জন্য খেলনা এনেছিলেন সুদীপন বিশ্বাস। ছোট্ট ঘরটা বোঝাই হয়ে গেছিল রঙিন কাগজে মোড়া খেলনার বাক্সে। এই অস্বাভাবিকতা গ্রামের লোকের কাছে ধীরে ধীরে হয়ে উঠছিল সরস আলোচনার বিষয়। এ বিষয়ে সব চাইতে ভাল খবর পাওয়া যেত সুদীপন বিশ্বাসের দাদা অধীর বিশ্বাসের কাছ থেকে। দুই ভাই-এর বাড়ি পাশাপাশি। দাদার আর্থিক অবস্থা ভাই-এর তুলনায় দুর্বল। সুদীপন বিশ্বাসের তিন কামরার পাকা বাড়ি। টিনের চাল দেওয়া। অধীর বিশ্বাস অবশ্য পঞ্চায়েত থেকে পাওয়া গৃহযোজনার টাকা খরচা করে ফেলেছিলেন বড় মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে।

অধীর বিশ্বাস মাঝে মধ্যে ভাটিখানায় বসে মদ গিলতে গিলতে আক্ষেপ করে বলত, 'আগে চাইলে দুশো-পাঁচশ পাইতাম ভাই-এর থেকে। এখন শালা এক টাকাও দেয় না। মাইনের আর্ধেক তো খেলনা কিনতেই খচ্চা করে।'

ভাটিখানার বাকি মাতালেরা শোনে। সুদীপন বিশ্বাসের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে দুঃখ পায়। কেউ কেউ জড়ানো গলায় বলে, 'এই করে যদি খুশি থাকে থাকতে দে না! কিছু একটা নিয়ে তো থাকতে হবে।'

এরপর একদিন সারা রাত বৃষ্টি হল। ভোরবেলায় নদীর জল বেড়েছে কি না দেখতে গিয়ে কেউ একজন শিহরিত হয়ে দেখল বাড়ির পেছনের ছোট বাগানে আমগাছের ডাল থেকে দুটো দেহ ঝুলছে আর দুলছে অল্প অল্প। সুদীপন আর মহুয়া আত্মহত্যা করেছে। এই খবরে গ্রামে তোলপাড় হলো। থানা-পুলিশ-ময়না তদন্ত ইত্যাদি শেষ হলে যখন মৃত দম্পতিকে দাহ করার জন্য শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন গ্রামের অর্ধেক লোক পা মিলিয়ে ছিল সেই অন্তিম যাত্রার সাথে। ভাটিখানায় অধীর বিশ্বাস কয়েক দিন অনুপস্থিত থাকলেন। বাকি মাতালেরা হিসেব করে বুঝতে চেষ্টা করল যে সুদীপন

মাস্টারের সম্পত্তি ঠিক কত হতে পারে।

অধীর বিশ্বাসই সেই সম্পত্তির দাবিদার। তাঁর কপাল খুলে গেল।

মাতালেরা ঠিকঠাকই ভেবেছিল। মাস ছয়েক পর দেখা গেল সুদীপন মাস্টারের ব্যাঙ্কে থাকা আটান্ন হাজার তিনশ সতের টাকা, আধা বিঘের জমির ওপর বাড়ি, জীবন বীমার সাত লক্ষ সমেত আরও আরও কিছু টাকা— সবই অধীর বিশ্বাস পেয়ে গেছেন। পাড়ার পঞ্চায়েত সদস্য প্রস্তাব দিল বাড়িটা আসামের এক পার্টির কাছে বেচে দিলে বারো-তের লাখ পাওয়া যাবে। মহুয়ার বাপের বাড়ির লোকেরা অবশ্য কিছু দাবি করেছিল। সেটা সুন্দরভাবে সামলে নিলেন অধীর। ভাই-এর আসবাব ইত্যাদি বেচেও কিছু টাকা এল।

সমস্যা হল কেবল বাইরের ঘরে বোঝাই হয়ে থাকা শ দেড়েক খেলনার বাক্স নিয়ে। সোনালি ফিতেয় বাঁধা রঙিন কাগজে মোড়া বাক্সের ভেতর কী খেলনা আছে কেউ জানে না। প্রথমে ঠিক করা হল সেগুলো গ্রামের শিশুদের বিলিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু সে বিষয়ে গ্রামের কোনও অভিভাবক আগ্রহ দেখাল না। পুরোহিত রজনী অধিকারি তো সোজাসুজি বলেই দিলেন, 'ওসব পুড়িয়ে ফেলাই ভাল। সুদীপন আর তাঁর বউ ওসব কাউকে ছুঁতে পর্যন্ত দিত না। ওই খেলনা যেন কেউ না নেয়।'

ফলে খেলনার ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্তে আসা গেল না। আসাম পার্টি আগাম টাকা দিয়ে বলে গেল মাস তিনেকের মধ্যে বাড়ির দখল নেবে। তার আগে যেন খেলনাগুলোর ব্যবস্থা করা হয়। তারপর বাড়িতে পুজো দিয়ে শুদ্ধিকরণ করতে হবে।

২

তারক রায় গরীব লোক। তবে রোজ মদ আর লটারির পেছনে টাকা খরচ না করলে সংসার টেনেটুনে চলে যেত। সেটা না হওয়ায় লতুকে অনেক পরিশ্রম করে দুই মেয়ে এক ছেলেকে মানুষ করতে হয়। অবশ্য মানুষ করা বলতে দু-বেলার ভাত যোগান। ছেলেটা ছোট। পাঁচ বছরও হয় নি। ক্ষয়াটে চেহারা নিয়ে এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। কিছু খেতে দিলে রাক্ষসের মত গপগপিয়ে খায়। মেয়ে দুটো কিশোরী হওয়ার পথে। তাঁদের আত্মসম্মান বোধ হয়েছে। ক্ষিধে পেলে ভাই-এর মত এর-তার বাড়িতে ঘুরঘুর করতে পারে না আগের মত। সুদীপন মাস্টার তাঁদের পাড়ার লোক ছিলেন। তাঁর বউ-এর সাথে মেয়ে দুটোর ভাবসাব ছিল। বাড়িতে সে সব নিয়ে যখন কথা হয় তখন তাঁরা বার বার উল্লেখ করে জমে থাকা খেলনার বাক্সগুলো নিয়ে। ভাইকে বলে, 'কত্ত খেলনা, জানিস! বলেছিল ছোটদের দিয়ে দেবে। বাড়িতে কেউ রাজিই হল না!'

একদিন দুপুরে তারক রায়ের ছেলে প্রভাত দুটো রঙিন কাগজে মোড়া খেলনার বাক্স নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বাড়িতে ঢুকল। লতু তখন উঠোন ঝাড় দিচ্ছিল। ছেলের উত্তেজিত আর আনন্দিত মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড হাঁ করে তাকিয়ে থেকে চাপা গলায় জিগ্যেস করলেন, 'কে দিল?'

'জেঠা।'

'অধীর দিছে? তুই চাইছিস?'

ছেলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। ইতিমধ্যে মেয়েরা টের পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। বড় মেয়ে বলল, 'দিছে তো ভাল করছে। দে তো দেখি কী আছে?'

বাক্স খুলে পাওয়া গেল দুটো চমৎকার গাড়ি। ব্যাটারিতে চলে। দুটো গাড়ির জন্য ব্যাটারি লাগবে ছ-টা। পাড়ার দোকানে দশ টাকায় শস্তার পেনসিল ব্যাটারি পাওয়া যায়। অন্তত তিনটে না হলে গাড়ি চলে না। কিন্তু তার জন্য চাই তিরিশ টাকা। অনেক কষ্টে ষাট-সত্তর টাকা জমিয়ে রেখেছিল লতু ভদ্রাকালীর মেলায় খরচা করবে বলে। ছেলের আনন্দিত মুখের দিকে তাকিয়ে তিরিশ টাকা বের করে দিল। গাড়ি দুটো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চালান হল তারপর। ছেলে তো বটেই, দুই কিশোরী মেয়েও যেন স্বর্গীয় আনন্দে মেতে উঠল কিছুক্ষণের জন্য। শেষে লতু বলল, 'ব্যাটারি ফুরায় গেলে আর চলবে না গাড়ি। এখন তুলে রাখ। বাপ আসিলে কিছু বলিস না। বাইরের কাউকেও কিছু বলার দরকার নাই।'

বিকেলের দিকে ছেলে বিছানায় গাড়ি দুটো নিয়ে খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়ল। লতু গেল পুকুরে স্নান করতে। মেয়েরা গেল বিধু মাস্টারের বাড়ি। তিনি ফ্রি-তে ছাত্রছাত্রী পড়িয়ে থাকেন। স্নান সেরে ভাত খেয়ে লতু একটু গড়াবে বলে ঘরে ঢুকে দেখল ছেলে

অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মাথার দু-পাশে দুটো গাড়ি। সে দুটো তুলে এক কোণে গুছিয়ে রাখতে গিয়ে লতু টের পেল ছেলের গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

লতু চমকে উঠল। অনেক জ্বর। ছেলেকে বুকে তুলে নিয়ে মনে হল তাঁর যেন চেতনা নেই। কয়েক বার ঝাঁকাল ছেলেকে। একটু নড়াচড়া ছাড়া আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। ছেলে কোলে সে দৌড়োল পাশের বাড়িতে। খগেশ্বর বর্মন তাঁর প্রতিবেশি। স্বচ্ছল গেরস্ত। ভাল লোক। তিনি খুব তাড়াতাড়ি গ্রামের হেলথ সেন্টারে ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স আনালেন। সেখানে ছোকরা ডাক্তার

লতু চমকে উঠল। অনেক জ্বর। ছেলেকে বুকে তুলে নিয়ে মনে হল তাঁর যেন চেতনা নেই। কয়েক বার ঝাঁকাল ছেলেকে। একটু নড়াচড়া ছাড়া আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

পত্রপাঠ পেশেন্টকে রেফার করে দিলেন ব্লক হাসপাতালে। সেখানে পরদিন বিকেল পর্যন্ত ধুম জ্বরে অচেতন হয়ে রইল ছেলে। জ্বর কমছেও না বাড়ছেও না। শেষে কর্তব্যরত মহিলা ডাক্তার নতুন একটা ওষুধ লিখে দিয়ে মৃদু স্বরে বললেন, ‘এতে কাজ না হলে সদর হসপিটালে নিয়ে টেস্ট করতে হবে।’

লতু একটানা ছেলের সাথে। তাঁর চেহারাও বিধ্বস্ত। তারক রায়ের সাথে থাকা পাড়ার দু-জন বলল, ‘আমরা আছি। তুই লতুরে নিয়া বাড়ি থেকে ঘুরি আয়। কাল থেকে তো প্রায় না খায়্যা আছে। রেস্ট না নিলে এরেও ভর্তি করা লাগবে।’

লতু অবশ্য রাজি হচ্ছিল না। কিন্তু ক্লান্তির কাছে হার মানল। হাসপাতালে বাচ্চাদের বিভাগে খুব একটা পেশেন্ট নেই। জানলার ধারে বসেছিল লতু। ছেলের শরীরে স্যালাইন দিয়ে জল আর ওষুধ ঢুকছে সেই কালকে থেকে। মুখটা একটু হাঁ করে ঘুমোচ্ছে ছেলে। তাঁর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে লতু হয় তো একটা চুমু দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু থমকে গেল। ছেলের ঘুমন্ত চোখ দুটো হঠাৎ খুলে গেছে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মায়ের দিকে। সেই অবস্থাতেই সে বলল, ‘আমার খেলনা নিচ্ছিস ক্যান?’

ধড়াস করে উঠল লতুর বুক। গলাটা ছেলের নয়। ছেলের গলার স্বর নয় এটা। অন্য কোনও বাচ্চা যেন কথা বলল এই মাত্র! ছেলের চোখ এর মধ্যেই আবার বন্ধ হয়ে গেছে। আবার আগের মত নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে সে। অচেতনের মত ঘুম। গায়ে ধুম জ্বর।

‘যাবি না?’

তারক রায় কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে লতু টের পায় নি। সে একটু চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে শুকনো গলায় বলল, ‘বাবু জানি কী কৈল। মুই শুনিছি। পস্ট করিয়া কৈল।’

‘বাবু?’ তারক রায় একটু মদ খেয়েছিল। ঝিম ঝিম ভাবটা উড়ে গেল তাঁর। ‘বাবু কাথা কৈল? ঠিক শুনিছিস?’

লতু আর কিছু বলল না। ছেলের গলা তো সে শোনে নি। সেটা বললে কি কেউ বিশ্বাস করবে।

‘তুই ভুল দেখিছিস। বাবুর সেন্স নাই। বাড়ি চল। ঘুমায় টুমায় রাতে আসিবি আবার। সদরে যদি নিতে হয় তো ট্যাকা পাইসা লাগিবে। তরে বাড়িৎ দিয়া মুই ফ্যাক্টরিৎ যাম। মালিক কসে কিছু দিবে।’

তারক রায় বলে যাচ্ছিল। লতু শুনছিল না। দুর্বল, অবসন্ন দেহে সে স্বামীর পেছন পেছন বেরিয়ে আসছিল হাসপাতাল থেকে। তাঁর কিছু একটা মনে হচ্ছিল। খারাপ কিছু একটা। ভয় লাগছিল লতুর। গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল।

৩

ব্লক হাসপাতাল থেকে বাড়ি আসতে প্রায় আধ ঘন্টা লাগল। লতু আর তাঁর বরকে বাইকের পেছনে বসিয়ে খগেশ্বর বর্মনের ছেলে যখন পাড়ায় ঢুকল তখন প্রায় সন্ধে। বাড়ির উঠোনে পা দিয়ে লতু বুঝতে পারল মেয়ে দুটোর একটাও ঘরে নেই। বোধহয় কারোর বাড়িতে গিয়ে টিভি দেখছে। উঠোনের পেয়ারা গাছে একটা পাঁচ ওয়াটের এলইডি বালব ঝুলিয়ে রাখা

আছে। তারক রায় সেই আলোটা জ্বালবে বলে পা বাড়াতেই টের পেল লতু তাঁর বাহু জড়িয়ে ধরেছে।

‘কী হৈল?’

‘বাবুর গলায় মুই অন্য বাচ্চার গলা শুনিসি।’

‘অন্য বাচ্চা?’

‘ওইটা বাবুর গলা না। ওইটা—।’ কথাটা শেষ না করে থেমে গেল লতু। ছোট উঠোনের একদিকে রান্না ঘর। পাশ দিয়ে কুয়োর পাড়ে যাওয়ার রাস্তা। সেখানে কুলগাছের তলায় একজন দাঁড়িয়ে। সে কোনও পূর্ণ বয়স্ক মানুষ নয়। একটা বাচ্চা। শান্ত অথচ তীব্র চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দু-জনের দিকে। সেই দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে হিম হয়ে যাচ্ছিল লতু। শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছিল। অতি কষ্টে হাঁটু মুড়ে বসে সে দু-হাত জোড় করে কোনওরকমে বলল, ‘তুই ক্যানে আসিলি বাউ?’

‘খেলনা মোক ফিরায় দে।’ কচি গলায় তীক্ষ্ণ সুরে ছিটকে এল কথাটা। ধপাস করে একটা শব্দ হল। তারক রায় জ্ঞান হারিয়েছে। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে লতু একবার হাত তুলে নিজের ঘরটা দেখিয়ে কোনওমতে অস্ফুটে বলল, ‘নিয়া যা।’

তারপরেই লুটিয়ে পড়ল উঠোনে। ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখল একটা ছায়ার মত কিছু ঢুকে গেল তাঁর ঘরে।

প্রায় আধঘন্টা পর দুই মেয়ে বাড়ি ফিরে দেখল বাপ-মা উঠোনে পড়ে রয়েছে। চিৎকার, চ্যাঁচামেচি, লোকজন ইত্যাদির পর দু-জনের চোখে মুখে জল ছিটিয়ে জ্ঞান ফেরাতে অবশ্য খুব একটা সমস্যা হল না। সকলেই ভেবেছিল যে পরিশ্রম আর টেনশনের কারণে দু-জন অজ্ঞান হয়ে গেছে। তারকের মুখ থেকে তো একটু আধটু গন্ধও বের হচ্ছিল মদের। কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসার পর লতু হাউমাউ করে যা বলল তাতে চক্ষু স্থির হয়ে গেল সকলের। এরপরেও পুরোটা বিশ্বাস করছিল না অনেকেই, কিন্তু ঠিক তখনই ব্লক হাসপাতাল থেকে ফোনে এল আশ্চর্য সংবাদ।

ছেলের জ্ঞান ফিরে এসেছে। সে বিছানায় উঠে বসেছে। জ্বর একদম নেই!

যথার্থই আনন্দ সংবাদ। কিন্তু সেটা শোনার পর সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেল। ভূতগ্রস্তের মত লতু ধীরে ধীরে প্রবেশ করল তাঁর ঘরে। আলো জ্বালল। তাকাল চারদিকে। খেলনা গাড়ি দুটো কোথাও নেই।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল লতু এতক্ষণে। বিছানার মলিন চাদরে একজোড়া মাটিমাখা অস্পষ্ট পায়ের ছাপ। কম্পিত হাতে সেই ছাপ স্পর্শ করে ফুঁপিয়ে উঠল লতু। বলল, ‘আর আসিস না বাউ। তুই না মোর বাবুরে ভাই ডাকাতিস!’

আমাদের জনপ্রিয় দুটি বই

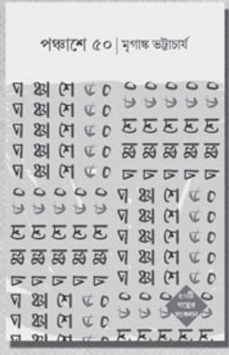

বিভিন্ন সময়ে লেখা পঞ্চাশটি গল্প নিয়ে এই বই। লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন জীবনের নানা রং, ভাললাগা, মনখারাপের নকশা।

মূল্য ২৫০ টাকা

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

ফেসবুকে প্রতি রবিবার লিখতেন ‘রোবনামচা’ কলম। এক বছরে প্রকাশিত সিরিজ নিয়ে দুই মলাটে প্রকাশিত হল পাঠকের জন্য।

তপন রায় প্রধান

মূল্য ১৯৫ টাকা

প্রাইভেটে লেখাপড়া

তনুশ্রী পাল

যৌথ মধ্যবিত্ত গৃহস্থবাড়ির বড় বউ ছিলেন মা। সংসারের নানান প্রয়োজনে সর্বদাই চরকিপাক খেতেন। আলাদা করে শুধু আমাদের তিন ভাইবোনকে পড়াতে বসানোর সময় প্রায় ছিলই না তাঁর। তার ওপরে চা-বাগানে বড় হয়ে ওঠা মায়ের ফুলবাগান, সেলাই, গান শোনা, গল্পের বই পড়ার শখও ছিল তীব্র। বাড়ির সামনেই প্রবেশ পথের দু'ধারে মায়ের হাতের সযত্ন লালিত ফুলবাগান আমাদের বাড়িটির শোভা বাড়িয়েছিল নিঃসন্দেহে। মা হাতের কাজ সারতে সারতেই যেটুকু পড়াতেন। যেমন উঠোনে বটি আর সব্জির ঝুরি নিয়ে বসেছেন তো পাশেই আমরা বসেছি বই স্লেট নিয়ে, তখন যেটুকু পড়ালেন। স্লেট পেনসিলে বা কাঠি দিয়ে উঠোনের মাটি খুদে খুদে অ আ, এ বি সি ডি লেখা, সংখ্যা লেখা, যোগ বিয়োগ করা সেসবও চলত। মা দেখে দিতেন, ভুল হলে রেগেও যেতেন, চড়-চাপাটি লাগিয়ে দিতেন। আমাদের যেমন খেলার দিকে মন পড়ে থাকত, মায়েরও হয়ত তেমন রান্নাঘরে ডাল ফুটছে বা অন্য কোনও তাড়া। আর বাবার কাঁধে তখন বড়সড় যৌথপরিবারটির দায় দায়িত্ব; সামাজিক দায়বদ্ধতা আরও নানান কিছুতে সদাব্যস্ত তিনি; সব মিলিয়ে ধৈর্য ধরে পড়ানোর সময় বা মন ছিল না। মনে আছে ইটালিকে এল আর ওয়াই শেখাতে গিয়ে বাবার সেই জলদগম্ভীর স্বরের ধমকে সব অক্ষর উল্টেপাল্টে,

চোখের জলে নাকের জলে একাকার হয়েছিল। বাবা বা মায়ের কাছে পাঠগ্রহণের আগ্রহ তেমন অনুভব করিনি।

শিক্ষকের কাজ তো শুধু পড়িয়ে দেওয়া, মুখস্থ করানো আর পরীক্ষা নেওয়া নয়, ছাত্রের মনে পাঠ্যবিষয়ে আগ্রহ আর ভালবাসা তৈরি করে দেওয়াটাই সবচেয়ে জরুরি। তবেই না ছাত্র নতুন নতুন বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হবে, ভালবেসে গ্রহণ করবে, আত্মীকরণ করতে পারবে। লাঠি, রক্তচক্ষু, নিলডাউন বা বকা ঝকা দিয়ে কি আর হৃদয়ের দরজা খোলে? যাইহোক এই বয়সে এসে বুঝি আমাদের ক্ষেত্রে ওই প্রথম পর্বের পাঠগ্রহণে শিক্ষক-ছাত্র দুই তরফেরই নিষ্ঠায় ও আগ্রহে খামতি ছিল। তবুও পড়াশুনোর প্রাথমিক ধ্যানধারণা মায়ের থেকেই সেটাও কিন্তু সত্যি। বাড়ির লোকের সময়াভাবে পরের পর্বে গৃহশিক্ষক এলেন আমাদের মানুষ করার জন্যে। প্রিয় পাঠক নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে ফেলেছেন ছাত্র ও শিক্ষক বিষয়ক কিছু টকঝালমিষ্টি অভিজ্ঞতা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেবার উদ্দেশ্যেই 'আমচরিত' ধারাবাহিকের এই অষ্টম পর্বে খাতা-কলম নিয়ে বসেছি।

আমাদের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন চক্কোত্তি বাড়ির মেজছেলে গুণদাদা। যেমন তাঁর রাজপুত্রের মত চেহারা তেমন শরিফ মেজাজের মানুষ। সম্ভবত তিনি সদ্য ম্যাট্রিক পাশ করেছেন বা কলেজে ভর্তি হয়েছেন। গুণগুণ করে সুর ভাঁজেন, এক-দুই একশো পর্যন্ত লেখা, হাতের লেখা, নামতা দশের ঘর পর্যন্ত, এবিসিডি, ওয়ানটু লেখা এইই। কিন্তু এর অনেকটাই তো আগে থেকে মায়ের কাছে শেখাই হয়ে গেছে। উনি এটা লেখ, এটা পড় বলেন, আর ভুলটুলগুলো সব নিজেই শুদ্ধ করে লিখে দিয়ে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বিদায় নেন! ওনাদের নিজস্ব একটা পারিবারিক থিয়েটার না যাত্রা কোম্পানি ছিল, ঠিক মনে নেই। উনি ঐতিহাসিক পালা লিখতেন, গান লিখতেন, সুর দিতেন নিজেদের ওই যাত্রা কোম্পানির জন্যে। গ্রামের সবাই তা জানত। আমার বাবাও গুণদাদার গুণমুগ্ধ ছিলেন সুতরাং তিনিই শিক্ষক। তা পড়াশুনো বলতে ওই প্র্যাকটিসটুকু হত এটা অস্বীকার করা যায় না। তার বড় বড় চোখের দিকে চেয়ে আমরা কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পেতাম না। তাঁদের পালা গানে তিনি রাজপুত্র-টুত্র সাজতেন, যেমন সম্রাট আকবর পালায় তিনি জাহাঙ্গীর, মমতাজমহল পালায় তিনি দারার চরিত্রে অভিনয় করতেন। সর্বদাই সে রেশটুকু যেন বজায় থাকত তাঁর হাঁটায়, চলায়, বলায়। যাইহোক সে পর্ব শেষ হল একসময়। গ্রাম ছাড়তে হল, হাইস্কুলে গেলাম আমরা।

শহরতলির হাইস্কুলে ভর্তি হলাম, নতুন জীবন, নতুন বন্ধু, নতুন স্কুল, নতুন পরিবেশ। ভাড়াবাড়িতে আমাদের তিনজনকে নিয়ে নতুন সংসার পাতলেন মা। নতুন মাষ্টারমশাই নিযুক্ত হলেন, নিরঞ্জন রাহা মশাই। তিনি আমাদের বারান্দায় বসে পড়াতেন, পড়া বলতে বেশিরভাগই বই দেখে দেখে লিখতে দেন। খাতার পাতা ভরে ওঠে নানা সাবজেক্টের বিস্তর লেখালেখিতে! মারধোর বকাবকি কিচ্ছু নেই। কিন্তু প্রায়ই তাঁর আগমনে ছেদ পড়ে। শেষে মা একদিন এ বিষয়ে মাষ্টারমশাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তিনি জানান, এরকম হলেই আমরা যেন বই খাতা নিয়ে ওনার বাড়িতে চলে যাই। কী যে আনন্দময় হয়ে উঠেছিল সেই শুভযাত্রা তা আর কী বলি! সে স্মৃতি আজও অম্লান! অপার স্বাধীনতা, পড়াশুনোর চাপ নেই বললেই চলে। আহা! এমন মাষ্টারমশাইও হয়! আমরা প্রথম প্রথম বেশ লজ্জা পেতাম ওনার বাড়িতে যেতে। গিয়ে দেখি মাষ্টারমশাইয়ের বাড়ি ভর্তি প্রচুর রোগা রোগা বাচ্চাকাচ্চা কিলবিল করছে, সবই ওনার সন্তান। তাদেরই কেউ চিলচিৎকারে আমাদের প্রথমদিনের আগমন সংবাদ জানান দেয়, 'মা, বই নিয়া পড়তে আসচে তিনটা ছাত্র। মা ওরা ইখানে দাঁড়ায় দাঁড়ায় হাসতেচে।'

তস্য রোগা মলিন চেহারার গুরুমা এসে আমাদের ভেতরে ডাকেন, 'আয় বারান্দায় পাটি পাইতা বস' বেশ খনখনে নীরস কণ্ঠে তিনি আমন্ত্রণ জানান। ঘরদোরের অবস্থা বাড়ির সদস্যদের মতই, দারিদ্রের ছাপ সবখানে। শুধু উঠোনের ধারে এক ফলন্ত সজনে গাছটাই যা সুন্দর; মাষ্টারমশাই দেখি বাঁশের কোটা দিয়ে সজনে পাড়তে ব্যস্ত। আমাদের দেখে একগাল হেসে বইখাতা খুলে লিখতে বলেন, 'ল্যাখ ল্যাখ বই খুইলা দেইখা দেইখা বাংলা ল্যাখ, আমি আসতেসি।'

আমরা বইখাতা খুলে বসি ঠিকই কিন্তু চারধারের দৃশ্য দেখি। সজনে পেড়ে কেটেকুটে কুয়োতলায় নিয়ে ধুয়ে মাষ্টারমশাই রান্নাঘরের দরজায় রেখে দেন। তারপর বারান্দায় রাখা কেরোসিন স্টোভে চা বানাতে বসেন। আধময়লা কাপে লিকার চা ছেঁকে ঘরের ভেতর বউকে দিয়ে আসেন একবাটি মুড়ি সমেত। বাচ্চাদেরও মুড়ি আর চা দেন, আমাদেরও একবাটি মুড়ি দেন। বলেন, 'চা খাবা তোমরা?' আমরা চা খাই না জানিয়ে দিই। মাষ্টারমশাই হাসিহাসি মুখে চায়ের কাপ আর মুড়ির বাটি নিয়ে পাটির একধারে বসেন। হাঁটু নাচিয়ে

এক দুঃখজনক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিই আজ, রেজাল্টের পরে জেনেছিলাম, প্রমাণও পেয়েছিলাম মাইনে অনুযায়ী স্যারের নোটসের শ্রেণিবিভাগ ছিল, সে হিসেবেই গ্রুপ তৈরি করে পড়াতেন।

নাচিয়ে গলা নামিয়ে বলেন, 'তোমাদের চানাচুর মুড়ি আর আদা-চা খাওয়াব একদিন, বুজচ?' মাষ্টারমশাইকে বেশ বন্ধু বন্ধু মনে হয়। তারপরে খানিক উচ্চকণ্ঠে বলেন, 'লিকচ তো তোমরা, আইচ্ছা। কয়টা বাজে, ইস্কুলের টাইম হইয়া যাবে। এখন বাড়ি যাও। চান খাওয়া কইরা ইস্কুল যাওগা। কাইল আইস।' গলা নামিয়ে বলেন, 'বুন্দির মা বাপের বাড়ি যাবে, তখন তোমাদেরে ঘুগনি বানায়ে খাওয়াব। এখন যাওগা।' আনন্দে ভরপুর চিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করি আমরা।

তবে শুধু হাতের লেখায় পড়াশুনো খুব একটা এগুচ্ছে না তা খানিক অনুভব করি বটে। কিন্তু আদা চা, চানাচুর মুড়ি, ঘুগনি, হাসিখুশি মাষ্টারমশাইয়ের প্রতি আমাদের বিশেষ প্রীতি জন্মায়। অবাধ আনন্দময় স্বাধীনতার স্বাদ যেন! মাষ্টারমশাই নিজে আমাদের চা খাওয়াবেন বলেছেন, যেই চা কিনা আমাদের বাড়িতে ছাত্রদের জন্যে নিষিদ্ধ! কিচ্ছুটি বলি না মাকে। এভাবেই চলতে থাকে পাঠপর্ব। বুন্দির মা বাপের বাড়ি যান ঘন ঘন ক'টা বাচ্চা নিয়ে, মাসখানেক থেকেই আসেন। মাষ্টারমশাই তখন খুব খুশি থাকেন, সঙ্গে আমরাও। গোটা তিনেক বাচ্চাকে এখানে রেখে বাকিগুলোকে নিয়ে গুরুমা বাপের বাড়ি গেলে মাষ্টারমশাইয়ের বাড়ি আনন্দের হাট! ঝাল ঝাল ছোট ছোলার ঘুগনি মুড়ি, চা চানাচুর, ছোট রেডিওর হিন্দি গান সহযোগে খাই দাই আর মনের আনন্দে বাড়ি ফিরি। কিন্তু চিরদিনই কাহারই বা সমান যায়? হাফইয়ার্লির করুণ রেজাল্ট তিনজনেরই, মায়ের কপালে ভাঁজ, আমরা খানিক লজ্জিত! মাষ্টারমশাইয়ের তেমন হেলদোল নেই! মা এবার খাতা চেক, স্কুলের পড়া ক্রশচেক করতে শুরু করেন, দশটার আগে ঘুমানো নেই, মা উলকাঁটা হাতে পাশে বসে থাকেন। জীবন ক্রমে কঠিন হয়ে ওঠে! আমরা মনে মনে খানিক কষ্ট পেলেও প্রাইভেট টিউটর চেঞ্জ হয়।

এবারে ধুতি পাঞ্জাবীর বিশালদেহী মাষ্টারমশাই সপ্তাহে পাঁচদিন পড়াতে আসতে লাগলেন। তিনি নাকি একসময়ে ওপার বাংলার এক হাইস্কুলের হেডমাষ্টারমশাই ছিলেন! সন্ধ্যায় আসেন, ঠিক দেড়ঘণ্টা চোখ বন্ধ করে বসে থেকে বিদায় হয়ে যান। প্রথম দু'দিন ভয়ে ভয়ে কাটিয়ে তৃতীয় দিনেই আমরা আবিষ্কার করে ফেলি, তিনি সত্যি পাঠদানের নির্দিষ্ট সময়টুকু গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকেন! কী ভাবে জানলাম? তাঁর নিদ্রা যে অকপট ও গভীর নিদ্রাই ছিল তার প্রমাণ কী? আছে আছে, বললে আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, কিন্তু স্বচক্ষে দেখা ঘটনাই আজ এত এত বছর পরে প্রকাশ করছি; হ্যাঁ স্যারের ঘাড় খানিক সামনে ঝুঁকে পড়ত, অল্প অল্প নাক ডাকত। আমরা তিনজন বিছানায় পাশাপাশি বসতাম আর উনি সামনের চেয়ারে, আমরা স্পষ্ট দেখতে পেতাম স্যারের সামান্য ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁটের দু'কষ বেয়ে সরু ধারায় লালা গড়িয়ে আসত! বইয়ের অক্ষরের থেকেও সেই ধারাপ্রবাহের গতিপ্রকৃতির দিকেই আমাদের নজর থাকত বেশি। বিপদসীমা অতিক্রমের আগেই অর্থাৎ শার্ট অব্দি পৌঁছনোর আগেই তিনি

সুরুত করে টেনে নিতেন আর লাল লাল চোখদুটো অল্প খুলে বলতেন, 'এই তোমরা পড়তেছ না? পড় পড়।' আবার ঘুম আবার সেই ধারাপ্রবাহ আর আমাদের উদ্বেগ! মনে হয় পড়ানো নয়, পাহারাদারি করাই যেন উদ্দেশ্য।

মা খুব উদ্বেগের সঙ্গে বিষয়টি লক্ষ্য করেন, আমাদের লালা বিষয়ক খুক খুক হাসিতে রেগে ওঠেন, মাষ্টারমশাইকে চা বানিয়ে দেন কিন্তু কিছু লাভ হয় না। ওনার চোখ থেকে ঘুম যেতে চায় না! মাস দুয়েক পরে নিরুপায় হয়ে ওনাকে বিদায় জানানো হল। আজ এত বছর পরে বুঝতে পারি আসলে উনি শারীরিক দিক থেকে যথেষ্ট অসুস্থ ছিলেন, অর্থের প্রয়োজনেই হয়ত আসতেন! এবারে নিয়োজিত হলেন বেত্রহস্তে মহা কড়া সুশীল মাষ্টার, পড়া দেওয়া, পড়া ধরা, দুবার বুঝিয়ে দেওয়া এবং পড়া বা অংক না পারলেই হাত পেতে থাকা, আর শপাং শপাং বেতের বাড়ি। দেখতে দেখতেই কী কঠিন আর দুর্বিষহ হয়ে উঠল জীবন! দাঁতে দাঁত চেপে পড়া তৈরির চেষ্টা করে যাই। পড়া হয়, পাশ হয় কিন্তু পড়ার মজা বা আনন্দ উপলব্ধ হয় না! এর মধ্যে আবার গানের দিদিমণি, সে আরও অসহনীয় ব্যাপার স্যাপার। অত রাগরাগিণী নিয়ে মাথাব্যথা কেনরে বাপু। 'এই মোম জোছনায় অঙ্গ ভিজিয়ে এসো না গল্প করি' 'এক বৈশাখে দেখা হল দুজনার' এরকম কত গান থাকতে যত দুনিয়া রাজ্যের গানের পরীক্ষার সিলেবাসের ঝামেলা, উফফফ! গান আর পড়াশুনো দুইয়ের সাঁড়াশি চাপে মন বিভ্রান্ত। তবে স্কুলে অত্যন্ত প্রিয় ক'জন টিচার ও তাঁদের প্রীতিময় পড়ানোর টেকনিক আজও মনে পড়ে, দূর থেকেই মনে মনে শ্রদ্ধা জানাই।

দেখতে দেখতে এইচএস এসে গেল, গ্রামের বাড়ি থেকে বাসে চেপে প্রাইভেট পড়তে যাই হাইস্কুলের বীরেন স্যারের কাছে। স্যারের খুব সুনাম, ওনার কাছে পড়ে কেউ কখনও ফেল করে নি, সুতরাং...। হায়ার সেকেন্ডারির আগের মাস তিনেক তিনি ক্রমাগত টেস্টপেপার সলভ করালেন। খুব ঠান্ডা মাথার মানুষ স্যার। একদম রাগটাগ নেই। পেপার সলভ করতে দিয়ে বাজারেও যান বা অন্য কাজে কিন্তু প্রত্যেকের খাতা চেক করেন, পরের দিনের পড়া দিয়ে দেন। যাইহোক ওনার কঠোর তত্ত্বাবধানে এইচএসের তরী ঘাটে ভিড়ল। নানান টকঝালমিষ্টি অভিজ্ঞতাসহ স্কুলপর্ব শেষ হল একদিন। জেলা শহরে মহিলা কলেজের খাতায় নাম উঠল, ইতিহাস প্রিয় বিষয় হলেও বাংলা অনার্স নিয়ে ভর্তি হলাম। নিজের স্বভাবদোষে নিজের ইচ্ছেটুকু অর্থাৎ ইতিহাস নিয়ে পড়ার আকাঙ্ক্ষার কথাও জোর গলায় যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠিত করা গেল না! চোখের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, আমার ছোটকাকা আর ছোটমা দুজনেই বাংলাতেই মাষ্টার্স করে দুটো ভালো জায়গায় পড়ান সুতরাং আমার ক্ষীণকণ্ঠের আবেদন চাপা পড়ে গেল।

যাইহোক ক্রমে সাহিত্যরস আস্বাদন করতে শিখলাম; বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসের গরিমায় মুগ্ধ হলাম। আমাদের কলেজ শিক্ষকদের কয়েকজনের মনোমুগ্ধকর পাঠদানের কৌশল বড় ভালো লাগল, কিন্তু অনার্স তো প্রায় সমুদ্র, এসময় ভালো গাইড পেলে চলাটুকু সুবিন্যস্ত ও নির্দিষ্ট হয়। পরীক্ষার ফল ভালো হলে ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব তো পড়েই। অনার্সের বন্ধুরা অনেকেই শহরের অন্য কলেজের বাংলা বিভাগের স্যারের কাছে পড়ত প্রথম থেকেই, আমাদের সে সাধ্য ছিল না। এক্কেবারে শেষপর্বে ফাইনাল পরীক্ষার আগে বাড়িতে আবেদন নিবেদন করে সেই স্যারের কাছে তিনমাসের জন্যে ভর্তি হওয়া গেল। দু একদিন পড়িয়েই স্যার খাতায় লেখা নোটস দিতেন, টুকে নিতাম, তাতেও উপকারই হত। তবে এক দুঃখজনক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিই আজ, রেজাল্টের পরে জেনেছিলাম, প্রমাণও পেয়েছিলাম মাইনে অনুযায়ী স্যারের নোটসের শ্রেণিবিভাগ ছিল, সে হিসেবেই গ্রুপ তৈরি করে পড়াতেন। কিন্তু সেবার ছোটমা পুজোর ছুটিতে বাড়ি এসে একটা পেপার অনেকটাই পড়িয়ে দিইয়েছিলেন। বিষয়ের গভীরে ঢুকে কী অপূর্ব সে পাঠদান, আজও ভুলি নি। পাঠ্যবিষয়ের বিভিন্ন অংশের ওপর খুদে খুদে অক্ষরে নোটস মাথায় একেবারে বসে যেত। অকালপ্রয়াত আমাদের সে ছোটমা তাঁর ছাত্রমহলেও খুব জনপ্রিয় ছলেন। শিক্ষক হিসেবে আমার আদর্শ তো বটেই।

ল্যাব ডিটেকটিভ

নিখিলেশ রায় চৌধুরী

সাহিত্যে ডিটেকটিভদের রহস্যভেদ পড়তে ভাল লাগে। বাস্তবে অপরাধী খুঁজে বের করতে পুলিশকে পরিশ্রম করতে হয়। তদন্তে নামার পর অনেক সময় ক্লু হারিয়ে যায়। সেই ক্লু খুঁজে বের করেন ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। এমন কিছু কেস এখানে তুলে দেওয়া হল, যেগুলির অপরাধী ফোরেনসিক ল্যাবরেটরিতেই ধরা পড়েছে। এ ছাড়াও থাকছে একাধিক ইন্টারেস্টিং কেস।

দ্বিতীয় পর্ব

৫

ব্যালিস্টিকসের উপর নির্ভর করে অপরাধ দমনের মতই বিশ্বজুড়ে পুলিশকে শক্তি জোগাল বিখ্যাত ব্রিটিশ ক্রিমিন্যাল প্যাথোলজিস্টদের গবেষণা। বিংশ শতাব্দীর ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞরা যা করে দেখালেন, তার কথা আগে ভাবা যায় নি। বার্নার্ড স্পিলসবেরি, ফ্রান্সিস ক্যাম্পস, কিথ সিম্পসন অসাধারণ কাণ্ড করলেন। পুলিশ যে সব খুনের কেস নিয়ে হিমশিম খেত, এই ক্রিমিন্যাল প্যাথোলজিস্টদের সৌজন্যে সেগুলির সমাধান অনায়াসে হয়ে গেল। বরাবরই ব্রিটেনে ফোরেনসিক ল্যাবের কাজ ছিল সমীহ জাগানোর মত। অপরাধের তদন্তে তাদের কোনও জুড়ি ছিল না। সব চাইতে ক্ষুরধার মেডিকো-লিগ্যাল ব্রেন ব্রিটিশ ফোরেনসিক ল্যাবরেটরিতেই ছিল। বাদ বাকি বিশ্বের পুলিশ তাঁদের কাছ থেকেই শিখেছে।

যখন এই বিশেষজ্ঞদের সামনে হিম হয়ে-যাওয়া লাশ, দলা-পাকানো মাংসের তাল কিংবা কয়েকটি হাড়ে লেগে-থাকা পোড়া মাংসের টুকরো হাজির করা হত, তখন তাঁরা কী করতেন? সেসব কেস শার্লক হোমসের গল্পের মত।

বিখ্যাত ক্রিমিন্যাল প্যাথোলজিস্টদের আবির্ভাবের আগে তেমন কোনও ঘটনা ঘটলে, পুলিশের কাজটা ছিল অনেকটা ডিডাকশনের উপর নির্ভরশীল। সন্দেহের উপর নির্ভর করে এগিয়ে যাওয়া। খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার মত।

জলে ডোবা কেস। অথচ ফুসফুসে জলের কোনও চিহ্ন নেই। তার মানে জলে ফেলার আগেই মেরে দেওয়া হয়েছে। পুড়ে মরার ঘটনা। অথচ ফুসফুসের টিস্যুতে ধোঁয়ার চিহ্নমাত্র নেই। মানে মেরে তারপর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মৃতের পাশে ঘুমের বড়ির খালি শিশি পাওয়া গেল। আত্মহত্যা। কিন্তু পুলিশ গিয়ে দেখল, গলার নলির হাড় ভেঙে গিয়েছে। মানে মৃত স্বেচ্ছায় বড়িগুলো খায় নি। জোর করে তাকে গলায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু খুনের জায়গায় পুলিশ গিয়ে যদি দেখে, কাদার তালের মত মানুষের মাংস পড়ে রয়েছে তখন তারা কী করবে?

জন জর্জ হে-র মত ভয়ংকর খুনি ধরা পড়েছিল প্রফেসর কিথ সিম্পসনের জন্য। হতভাগ্যকে অ্যাসিডে চুবিয়ে মেরেছিল খুনি। পুলিশ পেয়েছিল কেবল চারশ’ পাউন্ড থকথকে মাংসের তাল। ক্রিমিন্যাল প্যাথোলজিস্ট কিথ সিম্পসন তার মধ্যে একটা গলস্টোন খুঁজে পেলেন আর একটা চুলের কাঁটা। এই দুটি ক্লু জন জর্জ হে-কে ফাঁসির তক্তায় চড়াল।

কয়েকটা মাংস আর হাড়ের টুকরো থেকে নিহতের পরিচয় বের করা ফোরেনসিক প্যাথোলজিস্টদের সামনে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ। এমন চ্যালেঞ্জ নিয়ে গোটা বিশ্বকে অবাক করে দেন স্যার বার্নার্ড স্পিলসবেরি। আজকের দিনে এক জন পপ স্টারের যা জনপ্রিয়তা, ব্রিটেনে স্যার বার্নার্ড স্পিলসবেরির খ্যাতিও ছিল সে রকম। আদালতে তাঁর উপস্থিতি ক্রিমিন্যালদের মনে ভীতির সঞ্চার করত। ক্রিমিন্যাল মাইন্ড পড়ে ফেলতে তাঁর এতটুকু অসুবিধা হত না। প্যাথোলজি নিয়ে গবেষণা করতে করতে অপরাধীদের সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যেখানে পৌঁছায় অন্য কেউ তার ধারেকাছেও ছিল না। স্যার বার্নার্ড স্পিলসবেরির জন্য ব্রিটেনের এক কুখ্যাত অপরাধী ডাঃ হাওলি ক্রিপেন ধরা পড়ে যায়।

ক্রিপেন কেসে স্যার বার্নার্ড স্পিলসবেরি যখন জড়িত হন তখন তাঁর মাত্র ৩৩ বছর বয়স। তখনও তিনি নাইটহুড পান নি। ১৯১০ সাল। সেই মামলা তাঁকে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দেয়।

ডাঃ ক্রিপেন আমেরিকান। লন্ডনে গিয়ে ডাক্তারি শুরু করে। তার স্ত্রী বেল ছিলেন দজ্জাল। স্বামীর সঙ্গে প্রেমের ন্যাকামি তিনি করতে পারতেন না। চারচোখো ক্রিপেন একজন সঙ্গিনী চাইছিল। ডাক্তারির সূত্রে তার এক কমবয়সী সঙ্গিনী জুটেও গেল। এথেল নিভ। জাতে ওঠার জন্য এথেল নাম পালটে হয়েছিল এথেল লেনিভ। এথেলের প্রেমে পাগল হয়ে বেল-কে ডিভোর্স করল ক্রিপেন। কিন্তু এথেলের সঙ্গে তার নতুন জীবন সুখের হল না। সব সময় ক্রিপেনের মনে হত, বেল তাকে দেখছে। ডাঃ ক্রিপেন ঠিক করল, বেলকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে।

ডাক্তার যখন, তখন খুন করা তার কাছে জলভাত। কিন্তু বেলকে যে ক্রিপেন পিশাচের মত মারবে, তা কেউ ভাবতে পারে নি। ক্রিপেন বেলকে বিষ খাওয়াল। মরে যাওয়ার পর টুকরো টুকরো করে কাটল। তার পর চুনের গাদায় সেই টুকরোগুলো চুবিয়ে দিয়ে আমেরিকায় পালিয়ে গেল।

ক্রিপেন আশা করেছিল, নিউ ওয়ার্ল্ডে সে নতুন জীবন শুরু করবে। কিন্তু সে আশা তার পূরণ হল না। ক্রিপেন কেস ইতিহাস হয়ে গেল। স্কটল্যান্ডের চিফ ইনসপেক্টর ওয়াল্টার ড্রিউ আমেরিকায় প্রথম মারকনি-র বেতারবার্তা পাঠালেন। খুনিকে ধরতে হবে। ডাঃ হাওলি ক্রিপেনের স্বপ্ন ওখানেই শেষ।

বেলের শরীরের খুব সামান্য টুকরোই মিলেছিল। সেই টুকরোগুলোই স্পিলসবেরিকে পরীক্ষা করার জন্য দেওয়া হল। কীভাবে বেলকে হত্যা করা হয়েছে এবং ডাঃ ক্রিপেনই হতাকারী কি না, সেটা দেখার জন্য টুকরোগুলো পরীক্ষা করতে বসলেন স্পিলসবেরি।

জলে ডোবা কেস। অথচ ফুসফুসে জলের কোনও চিহ্ন নেই। তার মানে জলে ফেলার আগেই মেরে দেওয়া হয়েছে। পুড়ে মরার ঘটনা। অথচ ফুসফুসের টিস্যুতে ধোঁয়ার চিহ্নমাত্র নেই। মানে মেরে তারপর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

স্পিলসবেরি প্রমাণ করে দিলেন, বেলের পাকস্থলিতে হায়োসিন বিষের চিহ্ন আছে। পালিয়ে যাওয়ার আগে ক্রিপেন ওই বিষ কিনেছিল। ফোরেনসিক সায়েন্স নিয়ে ব্রায়ান মেরিনারের বিখ্যাত বই “অন ডেথ’স ব্লাডি ট্রেল”। এই কেসে স্পিলসবেরি কী করেছিলেন, ব্রায়ান মেরিনার লিখে গিয়েছেন। পাকস্থলিতে বিষ পাওয়ার পর স্পিলসবেরি আর একটা ক্লু পেলেন। তলপেটের মাংসের একটা টুকরো। তাতে অপারেশনের দাগ রয়েছে। মিসেস ক্রিপেনের তলপেটে একটা অপারেশন হয়েছিল। ক্রিপেনের

কৌঁসুলির বিশেষজ্ঞরা বললেন, মাংসটা উরুর মাংস। যেটা দেখে পুরানো অপারেশনের দাগ মনে হচ্ছে, সেটা আসলে চামড়ার ভাঁজ। স্পিলসবেরি ঠাণ্ডা মাথায় তাঁদের দাবি খণ্ডন করলেন। তিনি দেখালেন, তলপেটের ত্বকের যেখানটা রেকটাস মাসলের সঙ্গে যুক্ত, মাংসের টুকরোটা সেখানকার। মানুষের অ্যানাটমি সম্পর্কে স্পিলসবেরির অসাধারণ জ্ঞান তাঁর সিনিয়রদের মাথা হেঁট করে দিল। স্পিলসবেরি মামলা জিতলেন। ক্রিপেন কেসের পর স্পিলসবেরি অসংখ্য খুনিকে ফোরেনসিক পরীক্ষার প্রমাণ পেশ করে ফাঁসির তক্তায় চড়ান। নাইটহুড পান। কয়েকশ' মামলার নিষ্পত্তি তিনি একাই করেছিলেন। অবসরের পর হাতে কোনও কাজ না-থাকায় একা হয়ে যান। আত্মহত্যা করেন।

৬

যেখানে অপরাধের কোনও সাক্ষী নেই সেখানে ফোরেনসিক প্যাথোলজিস্টদের পেশ-করা এভিডেন্সের মূল্য অপরিসীম। ১৯৫৪ সালে নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে জুলিয়েট ম্যারিয়ন হিউম আর পলিন জোভান পার্কারকে আদালতে হাজির করা হল, তখন গোটা দুনিয়ার চোখ সেই খবরের উপর গিয়ে পড়ল।

কেসটার সঙ্গে অদ্ভুত মিল আর একটি কেসের। ১৯২৪ সালের মে মাসে শিকাগোয় লিওপোল্ড আর লোয়েব নামে পয়সাওয়ালা ঘরের দুই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ববি ফ্র্যাঙ্কস নামে ১৪ বছরের একটি ছেলেকে অপহরণ করে খুন করে। সেই সময় কেসটি নিয়ে মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়। দুজন ভদ্র ইন্টেলেকচুয়াল, সমাজে যারা সুস্থ এবং কমবয়সীদের প্রতি স্নেহপ্রবণ বলে পরিচিত, তারা কী করে এ রকম একটা কাজ করতে পারে? তাঁদের স্তম্ভিত করে দিয়েছিল অপরাধীদের স্বীকারোক্তি। স্রেফ থ্রিলের জন্য লিওপোল্ড আর লোয়েব এ কাজ করেছিল। এমন একটা খুন যা একেবারে নিখুঁত। কেউ সন্দেহ করবে না!

জুলিয়েট হিউম আর পলিন পার্কারের কেসও শিকাগো-র লিওপোল্ড-লোয়েব কেসের মত।

জুলিয়েন হিউম আর পলিন পার্কার ছিল হরিহর আত্মা। তাদের সন্দেহ হল, পলিন পার্কারের মা অনোরা মেরি পার্কার চাইছেন না দুজনের বন্ধুত্ব থাকুক। তাদের মাথায় শয়তানি চাপল। দুজনে মিলে ৪৫ বছরের অনোরা মেরি পার্কারের মাথায় মুখে বাড়ির পর বাড়ি মেরে হত্যা করল। পুলিশের যাতে সন্দেহ না হয়, তার জন্য দাবি করল মিসেস পার্কার পড়ে মারা গিয়েছেন।

১৯৫৪ সালের ২২ জুন। বিকেলবেলা চায়ের সময় ক্রাইস্টচার্চের একটি ছোট রেস্টুরেন্টে দুই বন্ধু ঝড়ের বেগে ঢুকল। দুজনের সারা শরীরে রক্ত। পলিন কাঁদতে কাঁদতে বলল, "মা চোট পেয়েছে। খুব চোট পেয়েছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে।" রেস্টুরেন্টের দায়িত্বে ছিলেন এক মহিলা ম্যানেজার। কাঁদতে কাঁদতে জুলিয়েন আর পলিন তাঁকে পুলিশে ফোন করতে বলল। শক কাটাতে দুজনে দু' কাপ চিনি দেওয়া চা-ও খেয়ে নিল। জুলিয়েন-পলিন আর পুলিশের সঙ্গে রেস্টুরেন্টের কয়েক জন খদ্দেরও কৌতূহলের বশে অকুস্থলে গেলেন। ছোট্ট সোঁতা। তার উপর একখানা ছোট্ট সাঁকো। ঠিক যেন লিলিপুল। সাঁকো পেরলেই ছোট্ট একটা পার্ক। সেখানে মিসেস পার্কারকে পড়ে থাকতে দেখা গেল। চারি দিকে রক্ত। মুখটা চেনার উপায় নেই। প্রাণও নেই।

কী ঘটেছিল, তার কোনও সাক্ষী পাওয়া গেল না। স্বাভাবিক ভাবে সবাই তখন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত দুটি মেয়ের প্রতিই সহানুভূতিশীল। পুলিশকে তারা জানাল, মিসেস পার্কার পাথুরে রাস্তার উপর পড়ে যান। পড়ে মাথা ফেটে যেতে দেখে তারা ভয় পেয়ে রেস্টুরেন্টে ছুটে যায়।

প্যাথোলজিস্ট যখন মৃতদেহ পরীক্ষা করলেন তখন তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। পরীক্ষার রিপোর্টে দেখালেন, মৃতার গলার চার দিকে কালশিটের দাগ। কেউ তাঁর গলা টিপে টেনে নীচে নামিয়ে ধরে রেখেছিল, সেইসঙ্গে মাথায়-মুখে ক্রমাগত আঘাত করেছিল। তাঁর অনুমান, অন্তত ৪৯ বার আঘাত করা হয়েছিল মিসেস পার্কারের মাথায়। জুলিয়েন হিউম আর পলিন পার্কারের দীর্ঘমেয়াদে কারাদণ্ড হল।

৭

ফোরেনসিক প্রতিভাদের আর এক স্পেশালিটি হল

বিষ। ব্রিটেনের খুনিরা অনেকেই বিষপ্রয়োগে সিদ্ধহস্ত। তাদের এক জন গ্রাহাম ইয়ং। গ্রাহাম ইয়ং ভেবেছিল, তার যা বুদ্ধি ফোরেনসিক এক্সপার্টরা কোনও দিনই তাকে ধরতে পারবেন না। কিন্তু ফোরেনসিক সায়েন্সের মিরাকেল তাকে ঠিক ধরে ফেলে।

অপরাধের ইতিহাসে গ্রাহাম ইয়ং 'ব্রডমুর পয়জনার' বলে পরিচিত। খুব কমবয়স থেকেই গ্রাহাম ইয়ং দেখত, কীভাবে তার দেওয়া বিষে অসহায় শিকারেরা মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে। ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। খাবি খেতে খেতে কেউ মারা যাচ্ছে দেখলে গ্রাহামের খুব ভালো লাগত। এভাবে সে একটা ক্ষমতার আনন্দ উপভোগ করত। ভাবত, আমিই ভগবান। যে কারও জীবন-মরণ আমার হাতে। এর পর কাকে মারা যায়! শয়তানির খেলায় সে তার ক্রূর বুদ্ধি কাজে লাগানোর জন্য নতুন করে চাঙ্গা হয়ে উঠত।

মাত্র ১৪ বছর বয়সে সৎ মাকে বিষ দিয়ে হত্যা করে গ্রাহাম ইয়ং। কিন্তু কেউ তা বুঝতে পারে নি। এর পর, বাবা, পিসি এবং স্কুলের এক বন্ধুকে বিষ খাওয়াতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। নয় বছর ব্রডমুর জেলে কাটায় ইয়ং। জেল থেকে বেরিয়ে আবারও বিষ প্রয়োগের সুযোগ খুঁজতে থাকে।

জেল থেকে বেরিয়ে ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে স্থানীয় সংবাদপত্রে ইয়ং একটি কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখতে পায়। হার্টফোর্ডশায়ারের বোভিংডনে জন হ্যাডল্যান্ড কোম্পানি একজন স্টোরম্যান চাইছে। হ্যাডল্যান্ড পুরানো ফ্যামিলি ফার্ম। উৎকৃষ্ট অপটিক্যাল, ফটোগ্রাফিক ইকুয়িপমেন্টের জন্য বিখ্যাত। ম্যানেজিং ডিরেক্টর গডফ্রে ফস্টার তার ইন্টারভিউ নিলেন। ইয়ং বলল, স্নায়বিক আঘাতের জন্য সে দীর্ঘকাল কাজের বাইরে ছিল। ফস্টার ট্রেনিং সেন্টারে খোঁজ নিলেন। ব্রডমুরেও খোঁজ নিলেন। সবাই ইয়ংয়ের প্রশংসা করলেন। তার কর্মক্ষমতা এবং সুস্থতা নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই, এমন সার্টিফিকেটও দিলেন। গডফ্রে ফস্টার গ্রাহাম-কে কাজে নিয়ে নিলেন। হ্যাডল্যান্ড কোম্পানি যম ডেকে আনল।

১৯৭১ সালের ১০ মে, সোমবার হ্যাডল্যান্ডে কাজে যোগ দিল গ্রাহাম। স্টোরম্যান হিসাবে সপ্তাহে ২৪ পাউন্ড খারাপ নয়। সপ্তাহে ৪ পাউন্ড দিয়ে এক কামরার ছোট ঘর ভাড়া করল। কিছু দিনের মধ্যেই সেখানে তার বিষের কাবার্ড ভরে উঠল। কাবার্ডে অ্যান্টিমনি টারট্রেটও ছিল। সৎ মা-কে এই বিষ দিয়ে মেরেই গ্রাহাম ইয়ং তার খুনের কেরিয়ার শুরু করেছিল।

কাজের জায়গায় গ্রাহাম ইয়ং শান্তশিষ্ট কর্মচারি বলেই পরিচিত ছিল। মাঝে মধ্যে মনে হত অন্যমনস্ক। কিন্তু কাজে কখনও ফাঁকি দিত না। সেই জন্য সকলেই তার প্রশংসা করত। এমনিতে ইয়ং চুপচাপ থাকত। তবে, রাজনীতি কিংবা রসায়ন নিয়ে কথা উঠলে তার মুখ খুলে যেত।

কাজের জায়গায় গ্রাহাম ইয়ংয়ের প্রথম বন্ধু হলেন রন হিউয়িট। বয়সে গ্রাহামের চাইতে বড়। ৪১ বছরের রন হিউয়িটও স্টোরম্যান ছিলেন। গ্রাহাম ইয়ং তাঁর জায়গাতেই কাজে যোগ দেয়। নতুন কর্মচারিকে কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল রন হিউয়িটের উপর। অন্য কর্মীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও তাঁর উপর ছিল। অনেকেই তার প্রতি দয়ালু ছিলেন। কেউ টাকা ধার দিতেন, কেউ সিগারেট। ইয়ং যথাসময়ে ধার মেটাত। নিজের কাছে সিগারেট থাকলে অন্যদের সিগারেট দিত। দেখতে দেখতে ইয়ং সবার ভালোবাসা আদায় করে নিল। ভোরে চায়ের ট্রলি ঢুকলে ইয়ং সবার আগে সেখানে হাজির। তখনও কেউ বুঝতে পারে নি, কেন সবার আগে গ্রাহাম ইয়ং ট্রলির কাছে পৌঁছায়।

জুন মাস থেকে শুরু হল আতঙ্ক। ইয়ং কাজে ঢোকার পর এক মাসও গেল না, ৫৯ বছরের স্টোররুম বস বব এগল অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাইরিয়া, ক্র্যাম্প, সেইসঙ্গে বমি বমি ভাব। তার পরেই মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লেন রন হিউয়িট। উপসর্গ এ-ক। তার উপর প্রচণ্ড পেট ব্যথা, গলায় অসহ্য জ্বালা। হ্যাডল্যান্ডের কর্মীরা ভাবলেন ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ।

আসলে, প্রত্যেককে থেলিয়াম দিয়ে স্লো-পয়জন করছিল গ্রাহাম। ইঁদুর মারার বিষ। কিন্তু এতটাই বিষাক্ত, যে বিষ দেবে কোনও ভাবে সেই বিষ তার জিভে লাগলে সে-ও মারা যাবে। লন্ডনের কেমিস্টদের

কাছ থেকে এই বিষ কিনেছিল গ্রাহাম। তার পর সেই স্বাদহীন, গন্ধহীন থেলিয়াম হ্যাডল্যান্ডের সহকর্মীদের চায়ে মিশিয়ে দিত।

৭ জুলাই স্টোররুম বস বব এগল মারা গেলেন। ভয়াবহ যন্ত্রণাময় মৃত্যু। ধীরে ধীরে তাঁর গোটা শরীর প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছিল। তার পর হার্ট ফেল করে। বব এগলের মরদেহের ইনকোয়েস্ট হল না। চিকিৎসকরা রিপোর্ট দিলেন, ব্রঙ্কিয়াল নিউমেনিয়া। সেইসঙ্গে পলিনিউরাইটিস। মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।

অগাস্টে কিছু হল না। সেপ্টেম্বর মাস থেকে ফের দুঃস্বপ্ন শুরু হল। গ্রাহাম ইয়ংয়ের পরবর্তী শিকার

অন্য রাষ্ট্রে জাল-জুয়াচুরির উদ্দেশ্যে এবং অন্তর্ঘাতের জন্য লাল চীনের মতো সন্ত্রাসবাদী দেশ এখন নিত্যনতুন এমন সব ফ্লুইড আবিষ্কার করছে, যার মোকাবিলা ফোরেনসিক সায়েন্টিস্টদের সামনে এক কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হলেন এক পার্ট-টাইম কর্মী ফ্রেড বিগস। ৩০ দিন ধরে অসহ্য শারীরিক কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করে তিনি মারা যান। এর পর আরও চার কর্মীর উপরে বিষ প্রয়োগ হয়। তাঁদের দুজনকে হাসপাতালে ভরতি করতে হয়। বিষে দুজনেরই চুল উঠে যায়। আর, বিষণ্ণতা এমন চেপে বসে, যা থেকে সারা জীবন তাঁরা মুক্তি পান নি। চার জনেই বিষ-মেশানো চা খেয়েছিলেন।

হ্যাডল্যান্ডের মালিকেরা উদ্বিগ্ন হলেন। কর্মচারিদের সঙ্গে কথা বলার জন্য তাঁরা এক স্থানীয় চিকিৎসককে নিয়ে এলেন। ডাঃ ইয়ান অ্যান্ডারসন। অ্যান্ডারসন বললেন, তিনি সব কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু কী থেকে এই সংক্রমণ, তা ধরতে পারছেন না। ইয়ং তার ইগো আর চেপে রাখতে পারল না। বিষ নিয়ে সে কত জানে বলতে আরম্ভ করল। মিটিংয়ে বলতে এসেছিলেন ডাঃ অ্যান্ডারসন, বলতে থাকল খুনি নিজেই। আর সেদিনই ফাঁদে পড়ে গেল।

কত রকমের বিষ রয়েছে, আর তার প্রতিক্রিয়া কী সে সম্পর্কে গ্রাহাম ইয়ং এমন বিবরণ দিল, ডাঃ অ্যান্ডারসনের সন্দেহ হল। কোম্পানি ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে তিনি কথা বললেন। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে ডাকা হল। তারা কোম্পানির সব কর্মচারির অতীত কাজকর্মের খবর জানতে চাইল। ব্রডমুরে গ্রাহাম ইয়ং কেন ঢুকেছিল, কত বছর জেলে ছিল তাও পুলিশি তদন্তে উঠে এল। সন্দেহ যথারীতি গ্রাহাম ইয়ংয়ের উপরেই পড়ল।

অল্ডারম্যাস্টনের সরকারি গবেষণা কেন্দ্র থেকে ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞরা হ্যাডল্যান্ডে গেলেন। তাঁদের সন্দেহ হল, এত মৃত্যু আর অসুস্থতার পিছনে রয়েছে থেলিয়াম বিষ। থেলিয়াম এমন একটি মেটাল বেসড পয়জন, যার কোনও স্বাদ-বর্ণ-গন্ধ কিছুই নেই। পুলিশ গিয়ে ইয়ংকে যখন তার বাবার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করল, সে তখন এগ স্যান্ডুইচ বানাচ্ছিল। সেই স্যান্ডুইচ তার আর খাওয়া হল না।

তখনও পুলিশ স্বস্তিতে নেই। কারণ, তাদের হাতে কোনও প্রমাণ নেই। বব এগল আর ফ্রেড বিগস, দুজনের মৃতদেহই পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের ভয়, আদালতে প্রমাণ দেখাতে না-পারলে খুনি হাতের বাইরে চলে যাবে।

কিন্তু ফোরেনসিক বিজ্ঞানের সূত্রে গ্রাহাম ইয়ং ধরা পড়ে গেল। মৃতদের একজনের চিতাভস্ম নিয়ে 'অ্যাটমিক অ্যাবসর্পশন স্পেকটোমেট্রি' করলেন ফোরেনসিক এক্সপার্টরা। প্রতি গ্রাম ছাইয়ের মধ্যে পাঁচ মাইক্রোগ্রাম থেলিয়াম পাওয়া গেল। তেসরা ডিসেম্বর গ্রাহামের বিরুদ্ধে এগলকে খুনের মামলা রুজু করল পুলিশ। গ্রাহাম বলল, সে নির্দোষ।

পরে তার নামে ফ্রেড বিগসকে হত্যা এবং আরও দুজনকে খুনের চেষ্টার মামলা রুজু হল। সেই সঙ্গে আরও দুই জনের উপর বিষ প্রয়োগের মামলা হল। ১৯৭২ সালে সেন্ট আলবানস কোর্টের গারদে ইয়ংয়ের ঠাঁই হল।

ফোরেনসিক সায়েন্স আর শুধু রক্ত, হাড়,

চুল-ত্বকের পরীক্ষায় আটকে নেই। লেসার থেকে আরম্ভ করে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ এখন অপরাধীকে খুঁজে বের করার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

বিশ্বের সেরা ফোরেনসিক ল্যাবরেটরিগুলির একটি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ফোরেনসিক ল্যাবরেটরি। লন্ডন মেট্রোপলিটান পুলিশের এই ল্যাবের সেরা লেসার এক্সপার্টদের একজন গ্রাহাম জ্যাকসন। তাঁর একটি বিখ্যাত মন্তব্য আছে। জ্যাকসন মজা করে বলতেন, ক্লুজ গ্লো ইন দা ডার্ক। অপরাধের সূত্র অন্ধকারেই খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর দাবি, লেসার টেকনোলজির মাধ্যমে অনায়াসে অপরাধী চিনিয়ে দেওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে এসেক্সের একটি কেসের কথা তিনি বলতেন।

একটি ট্রাক ধাক্কা মেরে পালায়। হিট অ্যান্ড রান কেস। এসেক্স পুলিশের এক অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হল লরিটা খুঁজে বের করার জন্য। একটি ট্রাক দেখে অফিসারের মনে হল, সেটাই খুনে ট্রাক। তিনি ট্রাকের রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা হাতে লিখে নিলেন। তার পর কাছে একটি টেলিফোন বক্স দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে থানায় খবর দিলেন। দেখা গেল, রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা ঘাতক লরির নয়। রাতে বাথটাবে স্নান করতে গিয়ে অফিসারের হাত থেকে লরির নম্বরটা উঠে গেল। পরের দিন উত্তর ইংল্যান্ডের যে থানায় ওই অফিসার ছিলেন সেখানে একটা টেলেক্স গেল। একটি লরি ছিনতাই হয়েছে। নম্বরটা দরকার।

হাতের উপর লেখা নম্বর উঠে গিয়েছে। অফিসার নম্বরটা মনে করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই নম্বরটা তাঁর মনে পড়ল না। তখন তাঁকে ফোরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হল। লেসার লাইটের নীচে ফেলে ল্যাব ডিরেক্টর ডাঃ রে উইলিয়ামস পুলিশ অফিসারের হাতের ছবি তুললেন। আগের রাতে সাবানের জলে মুছে-যাওয়া রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা পরিষ্কার ফুটে উঠল! অফিসার লেসার টেকনোলজির ক্ষমতা দেখে যত না আশ্চর্য হলেন, তার চাইতে বেশি অবাক হাতখানা আস্ত দেখে। ঘটনাটা এভাবেই মজা করে বলেছিলেন ডাঃ রে উইলিয়ামস।

ফিঙ্গারপ্রিন্ট তোলাও লেসার টেকনোলজির জন্য অনেক সোজা হয়ে গিয়েছে। আগে অকুস্থলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট তোলার জন্য অ্যালুমিনিয়াম পাউডার ছড়ানো হত। কিন্তু তাতে সব সময় কাজ হত না। কিন্তু অপরাধীদের পক্ষে লেসার রশ্মি এড়ানো আর সম্ভব হল না। অন্ধকার ঘরে লেসারের আলোয় আঙুলের ছাপ ঠিক ফুটে ওঠে। মানুষের শরীরে যত রকমের অ্যাসিড আছে, লেসার রশ্মি ঠিক তাকে চিনিয়ে দেয়। কয়েকশ' আঙুলের ছাপ ফুটে ওঠে। অ্যালুমিনিয়াম পাউডারে যা শনাক্ত করা যেত না। এমনকী, নথি জাল করার জন্য যদি কোনও জোচ্চোর ভ্যানিশিং বা কারেকশন ফ্লুইড ব্যবহার করে সেখানে অন্য কোনও শব্দ বসায়, ঠিকভাবে লেসার পরীক্ষার মাধ্যমে তাও ধরে ফেলা যায়। কোন শব্দ পালটে নতুন শব্দ বসানো হয়েছে, লেসার পরীক্ষায় তা ধরা পড়ে যায়। সেইসঙ্গে আঙুলের ছাপ থাকলে আঙুলের ছাপ। যদিও অন্য রাষ্ট্রে জাল-জুয়াচুরির উদ্দেশ্যে এবং অন্তর্ঘাতের জন্য লাল চীনের মতো সন্ত্রাসবাদী দেশ এখন নিত্যনতুন এমন সব ফ্লুইড আবিষ্কার করছে, যার মোকাবিলা ফোরেনসিক সায়েন্টিস্টদের সামনে এক কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়েক বছর আগে, ভুটান সীমান্তের কাছে, উত্তরবঙ্গের জয়গাঁয় এমনই এক চাইনিজ ভ্যানিশিং কালির সন্ধান মিলেছিল। যে কোনও লেখা তাতে উঠে যায়। আগে কী লেখা ছিল, তার আর কোনও হদিশ পাওয়া যায় না। জেলে জোচ্চোর তেলগি-র মৃত্যুর পর তার শত শত কোটি টাকার জাল স্ট্যাম্পপেপার কেলেঙ্কারিও অদ্ভুতভাবে চাপা পড়ে গেল। বাইরের রাষ্ট্রের মদত না-থাকলে এই কাজ সে কখনই করতে পারত না। কন্নড়ি মুসলমান তেলগি-র শাগরেদ ছিল এক বাঙালি বামুন। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ফোরেনসিক ল্যাবরেটরির হাতে জাল স্ট্যাম্পপেপারগুলো পড়লে হয়তো সত্য জানা যেত।

মেট্রোপলিটন পুলিশ ল্যাবরেটরির গ্রাহাম জ্যাকসনের মতে, লেসার আসার পর ফোরেনসিক তদন্ত পদ্ধতি আরও উন্নত হয়েছে। জুতোর ছাপ, আঙুলের ছাপ, ফাইবার, লাশের গায়ের দাগ, ছোপ সবই ধরা পড়ে যায়। খোলা চোখে যা ধরা পড়ে না, সেইসব এভিডেন্স লেসার টেকনোলজি ব্যবহার করে তুলে আনা সম্ভব।

(আগামী সংখ্যায় নতুন কাহিনি)

ডুয়ার্সের বইপত্র। রংরুটের বইপত্র। ছোটদের বইপত্র

ডুয়ার্স বেস্ট সেলার

রোবনামচা। তপন রায় প্রধান। ১৯৫ টাকা
তিস্তা - উৎস থেকে মোহনা। অভিজিৎ দাশ। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি। দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা ***
চায়ের ডুয়ার্স কী চায়? গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা
ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে? সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা ***
আলিপুরদুয়ার। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
কোচবিহার ২য় সংস্করণ। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
জলপাইগুড়ি। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ৩০০ টাকা
এখন ডুয়ার্স সাহিত্য ২০২০। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৯৫ টাকা
গণ আন্দোলনে কোচবিহার। হরিপদ রায়। ২৪০ টাকা
রাণী নিরুপমা দেবীর নির্বাচিত রচনা। দেবায়ন চৌধুরী। ১৬০ টাকা
শ্রম ও জীবিকার উত্তরপক্ষ। প্রশান্ত নাথ চৌধুরী। ১৬০ টাকা
কথায় কথায় জলপাইগুড়ি। রণজিৎ কুমার মিত্র। ২০০ টাকা
আদিবাসী অসুর সমাজ ও সংস্কৃতি। প্রমোদ নাথ। ১৬০ টাকা

ডুয়ার্সের গল্প সংকলন

পঞ্চাশে ৫০। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা ***
লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
সব গল্পই প্রেমের নয়। হিমি মিত্র রায়। ১৬০ টাকা
দিল সে দিল্লী সে। কল্যাণ গোস্বামী। ২৯৫ টাকা

ডুয়ার্সের পেপারব্যাক সিরিজ

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস। সংকলন। ১৯৫ টাকা
তরাই উৎরাই। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৬৫ টাকা
লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা
শালবনে রক্তের দাগ। ১২৫ টাকা
অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
কুহুলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

বিসমিল্লার সানাই চৌরাশিয়ার বাঁশি। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা
বোধিবৃক্ষ ছুঁয়ে এক চির ভিক্ষুক। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা
সিকিম। সংকলন। ২০০ টাকা ***
নর্থ ইস্ট নট আউট। গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা
রংরুটে হিমালয় দর্শন। সংকলন। ২০০ টাকা ***
উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে। প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা ***
সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে। সংকলন। ১৫০ টাকা ***
মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা উর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা ***
সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা ***

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা
জয় জল্পেশ। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৯০ টাকা

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা ***
সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা
পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
তিন মহাদেশ দশ দিগন্ত।
শান্তনু মাইতি। ১৭৫ টাকা
মুর্শিদাবাদ। জাহির রায়হান। ১৯৫ টাকা
বাংলার উত্তরে টই টই। দ্বিতীয় সংস্করণ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৯৫ টাকা

বিষয় নাটক

নাট্য চতুষ্টয়। রবীশ্বর ভট্টাচার্য। ১৬০ টাকা
নির্বাচিত বেতার-শ্রুতি নাট্যগুচ্ছ। সমর চৌধুরী। ২৪৫ টাকা
বাঙ্ময়। সব্যসাচী দত্ত সম্পাদিত। ১২৫ টাকা

শুরু হল ছোটদের সিরিজ

গাছ গাছালির পাঠ পাঁচালি। শ্বেতা সরখেল। ১৯৫ টাকা
ডুয়ার্স ভরা ছন্দ ছড়া। বৈকুণ্ঠ মল্লিক সম্পাদিত। ১৯৫ টাকা

*** প্রায় নিঃশেষিত

এখন ডুয়ার্স

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।

হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৬২৯৭৭৩১১৮৮ নম্বরে

ন্যূনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

আমাদের অনলাইন শোরুম **www. dooarsbooks.com**

গরমে শীতলতা আনে ঝিঙে বাহার

ঝিঙে পোস্তর থেকে বেশি নামিদামি রান্না হয়ত ঝিঙের জন্য তেমন কেউ করেন না বা ভাবেন না। পাঁচমিশালি সবজির একটি হিসেবে হয়ত বা কেউ ডালে দিল, কিংবা খুব বেশি হলে পাতলা মাছের ঝোল। কারণ ঝিঙের নিজের তেমন কোনও স্বাদ নেই, তাই অন্য কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে স্বাদ আনতে হয়। বেশিরভাগটাই জল থাকে এতে। মায়ের কাছে শেখা একটা পুরনো দিনের ঝিঙের তরকারি আজ সবার জন্য দিচ্ছি।

মটর ডাল অন্তত পাঁচ ঘণ্টা ভেজানো থাকবে। খুব গরমকালে জল দিয়ে ফ্রিজে রাখা যেতে পারে।

ঝিঙেগুলো শির ফেলে দিয়ে ছুলে নিতে হবে। তারপর মাঝখান থেকে চিরে পুরো দু-টুকরো করে নিয়ে দুই-তিন ইঞ্চির মত মাপে কেটে নিতে হবে। ধুয়ে ভালো করে জল ঝরিয়ে রাখতে হবে। পোস্ত আর সাদা তিল বেটে নিতে হবে।

ভেজানো মটরডাল পেস্ট করে নিতে হবে যতটা সম্ভব কম জলে। পরিমাণ মত নুন দিয়ে ডালবাটাটা ফেটিয়ে নিয়ে ডোবা তেলে মাঝারি সাইজের বড়া ভেজে নিতে হবে। সর্ষের তেলে মেথি ফোড়ন দিয়ে ভাজা হলে মেথিগুলো তুলে ফেলে দিতে হবে। এরপর কালোজিরা আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ঝিঙে দিতে হবে। একটু ভেজে নুন আর চিনি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। খুব অল্প সময়ে প্রচুর জল বেরিয়ে আসবে। একটি বাটিতে কয়েক হাতা দুধের সঙ্গে আদাবাটা, পোস্ত আর তিলবাটা মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর আরও দু-চারটে কাঁচা লঙ্কা আর এক চামচ ঘি দিয়ে সামান্য ফোটালেই ঝিঙে সেদ্ধ হয়ে যাবে। এরপর ডালের বড়াগুলো দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। ঝোল বেশ ভাল পরিমাণ রাখতে হবে। তার কারণ ডালের বড়া অনেক ঝোল টেনে নেবে। আর খাবার সময় একফোঁটা ঝোল থাকবে না। তাই সেটা বুঝে ঝোল বানাতে দুধের সঙ্গে জলও মেশাতে হতে পারে। আর স্বাদমত নুন/চিনি দিয়ে দেবেন। যে যেরকম ঝাল খাবেন সেইমত কাঁচা লঙ্কা দিয়ে রান্না করবেন।

গরমে এরকম একবাটি সবজি খেলেই শরীর ঠান্ডা থাকবে।

পাতা মিত্র

পুরাণের নারী

রাজমহিষী সুদেষ্ণা

শাঁওলি দে

মহাভারত এমন এক বিরাটাকার কাহিনী যার মধ্যে যেমন লুকিয়ে আছে হাজারও কথা-উপকথা, তেমনই অসংখ্য চরিত্র। সেইসব হাজার চরিত্রের মধ্যে সবই যে তেমনভাবে গুরুত্ব পেয়েছে তা নয়। এমন অনেক নারী পুরুষের কথা ঢাকা পড়ে গেছে কিছু তথাকথিত উজ্জ্বল ও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের আড়ালে। পরবর্তীকালেও কোনও কাহিনীকারই সেইসব চরিত্র রূপায়ণে নিজেদের শ্রম ব্যয় করেন নি। তাই তাঁদের কথা লোকের মুখে মুখে ফেরে না, অথচ বিভিন্ন

সুদেষ্ণা ও দ্রৌপদী

ঘটনায়, কাহিনীর ঘাত প্রতিঘাতে তাঁদের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা কম নয়।

সুদেষ্ণা এমনই এক নারীর নাম। বিরাটপর্বে প্রথমবার সুদেষ্ণার নাম পাওয়া যায়। অজ্ঞাতবাসে পঞ্চপাণ্ডব যখন ছদ্মবেশে বিরাটরাজের কাছে আশ্রয় নেন, সেইসময় দ্রৌপদীকে এক ঝলক দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। সুদেষ্ণা ছিলেন সুত রাজা কেকয় ও রাণী মালভীর কন্যা।

অজ্ঞাতবাসকালে দ্রৌপদী যখন বাইরে বিচরণ করছিলেন তখন প্রাসাদ থেকে রাণী সুদেষ্ণা তাঁকে দেখতে পান, এবং তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে ওপরে ডেকে পাঠান। দ্রৌপদী এলে সুদেষ্ণা তাঁর পরিচয় জানতে চান। দ্রৌপদী উত্তরে বলেন তিনি সৈরিন্ধ্রী। কেউ যদি তাঁকে পালন করেন তবে দ্রৌপদী সব কাজ করে দেবেন, দাসী হয়ে থাকবেন। সুদেষ্ণা তখন বলেছিলেন, দ্রৌপদীর যা রূপ তাতে তিনি নিজেই দাস দাসীকে আদেশ করার যোগ্য। দ্রৌপদীর রূপের প্রশংসায় তিনি বলে উঠলেন, "তোমার পায়ের গ্রন্থি উচ্চ নয়, দুই উরু ঠেকে আছে, তোমার নাভি কণ্ঠস্বর ও স্বভাব নিম্ন, স্তন নিতম্ব ও নাসিকা উন্নত, পদতল করতল ও ওষ্ঠ রক্তবর্ণ, তুমি হংসগদ্‌গদভাষিণী, সুকেশী, সুস্তনী। তুমি কাশ্মীরী তুরঙ্গমীর ন্যায় সুদর্শনা। তুমি কে? যক্ষী দেবী, গন্ধর্বী না অপ্সরা?"

দ্রৌপদী তাঁর আসল পরিচয় গোপন করে জানালেন তিনি সত্যই সৈরিন্ধ্রী, আগে কৃষ্ণ ভার্যা সত্যভামা ও পাণ্ডবমহিষী কৃষ্ণার পরিচর্যা করাই ছিল তাঁর কাজ। এর পরিবর্তে তিনি পেতেন খাদ্য ও বসন। সৈরিন্ধ্রীর রূপে ও গুণের কথা শুনে মুগ্ধ সুদেষ্ণা জানালেন যদি তাঁর স্বামী বিরাট এঁর রূপে প্রলুব্ধ না হন

তবে সুদেষ্ণাই তাঁকে মাথায় করে রাখবেন। সেই সঙ্গে সুদেষ্ণা সন্দেহও প্রকাশ করলেন যে সৈরিন্ধ্রীকে দেখে রাজপ্রাসাদের সব নারীই এমন দৃষ্টিতে দেখছে তো পুরুষেরা লোভাতুর হয়ে উঠবে না কেন? এমনকি বৃক্ষরাজিও তাঁকে দেখে কুর্ণিশ জানাচ্ছে। এমন রূপের দেখা পেলে বিরাটরাজ তো সুদেষ্ণাকে ভুলেই যাবেন। একটি স্ত্রী কাঁকড়া যেমন এই জেনেও গর্ভধারণ করে যে এরপরই তার মৃত্যু হবে, তেমনই সুদেষ্ণাও জেনেবুঝেই তাঁকে আশ্রয় দেবেন। সৈরিন্ধ্রীরূপী দ্রৌপদী তখন তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, বিরাট বা অন্য কেউই কখনও তাঁকে পাবেন না, কারণ প্রবল বলশালী পাঁচজন গন্ধর্ব যুবক তাঁর স্বামী, যাঁরা সর্বদা তাঁকে রক্ষা করেন। সৈরিন্ধ্রীর কথা শুনে সুদেষ্ণা কথা দিলেন, তাঁকে তাঁর ইচ্ছামতই তিনি রাজপ্রাসাদে রাখবেন, কারও উচ্ছিষ্ট বা চরণ ওঁকে স্পর্শ করতে হবে না।

যদিও শেষ পর্যন্ত সুদেষ্ণা কথা রাখতে পারেন নি। সুদেষ্ণার ভাই কীচক দ্রৌপদীর রূপে কামার্ত হলে প্রথমে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরে সৈরিন্ধ্রীকে সুরা আনানোর অছিলায় কীচকের কাছে পাঠান। কীচক অশ্লীল আচরণ করলে ক্ষুব্ধ দ্রৌপদী বিরাট রাজার পাকশালায় পাচক হিসেবে থাকা ভীমকে গিয়ে সব কথা জানান। বল্লভরূপী ভীম সব শুনে কীচককে হত্যা করে প্রতিশোধ নেন। সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে আর রাখার সাহস পান না, তাঁকে ইচ্ছেমত চলে যাওয়ার কথা বলায়, দ্রৌপদী তেরদিন সময় চেয়ে নেন, কারণ অজ্ঞাতকাল শেষ হতে আর ততদিনই বাকি ছিল।

সুদেষ্ণার চার সন্তান— উত্তর, উত্তরা, শ্বেতা ও শঙ্খ। কৌরবেরা বিরাটরাজ্য আক্রমণ করলে তিনিই সৈরিন্ধ্রীর কথা অনুসারে পুত্র উত্তরকে যুদ্ধের সঙ্গী হিসেবে বৃহন্নলারূপী অর্জুনকে নিতে বলেন। কিন্তু উত্তর রাজি হন না, কারণ তিনি চান নি কোনও নারী তাঁর রথে বসুক। সুদেষ্ণা তখন জোর করেন এবং বলেন যে সৈরিন্ধ্রী যখন বলেছেন একথা তবে তা সত্য হতে বাধ্য। যুদ্ধে অর্জুন কৌরবদের পরাস্ত করলে উত্তরের প্রাণ রক্ষা হয়।

অজ্ঞাতপর্ব শেষে যখন সুদেষ্ণা জানতে পারেন সৈরিন্ধ্রী আসলে পাণ্ডব মহিষী দ্রৌপদী তিনি স্বভাবতই ভয় পেয়ে যান। এমন মহিষীকে তিনি নিজের দাসীর কাজ করিয়েছেন? কিন্তু দ্রৌপদী ও পঞ্চ পাণ্ডব সকলকে ক্ষমা করে দেন এমনকি অর্জুন ও সুভদ্রাপুত্র অভিমুন্যর সঙ্গে উত্তরার বিয়েও দেন।

পরবর্তীতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সুদেষ্ণা স্বামী পুত্র সকলেই পাণ্ডবদের পক্ষে অংশ নেন এবং প্রথম দিনের যুদ্ধেই সুদেষ্ণা সন্তান হারান। অবশ্য অভিমুন্য ও উত্তরার পুত্র পরীক্ষিৎই হস্তিনাপুরের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। অভিমুন্য আগেই মারা যান, অশ্বত্থামার বাণে উত্তরা ও অভিমুন্যর সন্তানও মৃত জন্ম নেয়। সেইসময় সুভদ্রা, উত্তরা ও অন্যান্যদের সঙ্গে রাজমহিষী সুদেষ্ণা কৃষ্ণের সামনে পরীক্ষিৎকে জীবিত করার জন্য কাতর আর্তি করেছিলেন। এরপরই

সুদেষ্ণার চরিত্রটি দোষেগুণে মিলিত একটি সাধারণ রমণীর মতই। তিনি দ্রৌপদীকে দেখে যেমন মুগ্ধতা প্রকাশ করতে কার্পণ্য করেন নি তেমনই মনের ভেতরে চলতে থাকা দ্বিধাদ্বন্দ্বও জানাতে ভোলেন নি। সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে যোগ্য সম্মান দিলেও নিজের ভাইয়ের প্রতি স্নেহে তাতে কিছুটা ঘাটতি পড়েই যায়।

কৃষ্ণের কৌশলে উত্তরা ফিরে পান সন্তান আর স্বামী সন্তানসহ প্রত্যেকেই যুদ্ধে মারা গেলেও সুদেষ্ণা পরিচিত হলেন ভবিষ্যত রাজার মাতামহরূপে।

সুদেষ্ণার চরিত্রটি দোষেগুণে মিলিত একটি সাধারণ রমণীর মতই। তিনি দ্রৌপদীকে দেখে যেমন মুগ্ধতা প্রকাশ করতে কার্পণ্য করেন নি তেমনই মনের ভেতরে চলতে থাকা দ্বিধাদ্বন্দ্বও জানাতে ভোলেন নি। সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে যোগ্য সম্মান দিলেও নিজের ভাইয়ের প্রতি স্নেহে তাতে কিছুটা ঘাটতি পড়েই যায়। আর এখানেই চরিত্রটির উত্তরণে কোথায় যেন কমতি থেকে যায়। যদিও যুদ্ধে স্বামী সন্তান হারানো শোকার্ত এই নারীকে পুরাণের নারী হিসেবে মর্যাদা দেওয়াই যায়।

EKHON DUARS, Vol-8, Issue-2 WBBEN/2014/56733 Rs. 20 only

KASHMIR

Date : 08/10/21 (Srinagar to Srinagar) 8 DAYS

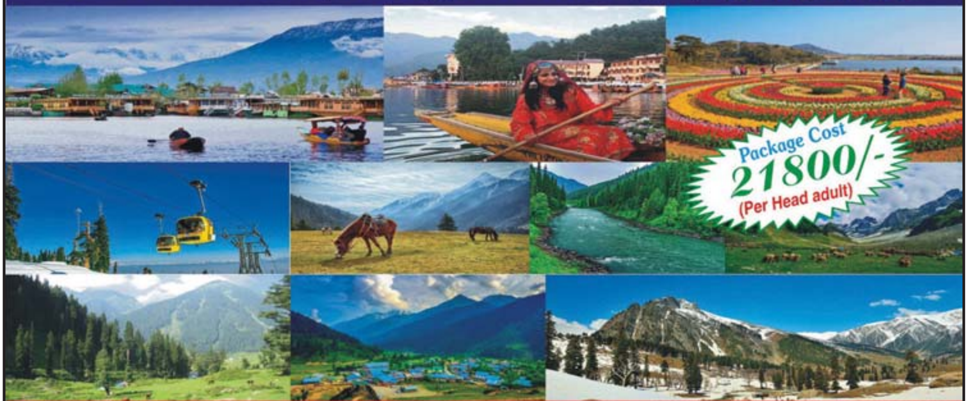

SRINAGAR, GULMARG, SONMARG, PAHALGAM

MADHYA PRADESH

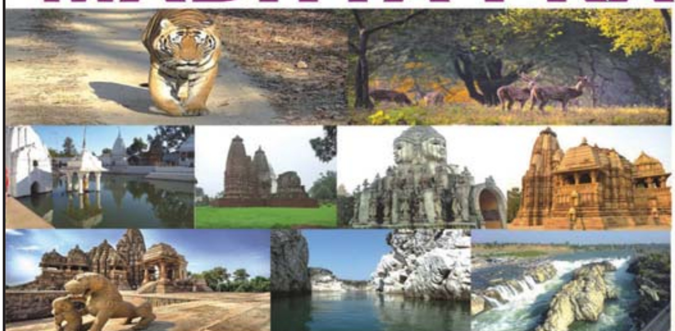

Package Cost
23900/-
(Per Head adult)

Date of Journey :
23/12/21
(Ex-NJP/NCB)
11 DAYS

BANDHAVGARH NATIONAL PARK, KANHA NATIONAL PARK, KHAJURAHO TEMPLE, AMARKANTAK - NARMADA KUND, JABALPUR MARBLE ROCKS ETC.

HOLiDAYAAR
TRAVEL BOOKS & BOOKINGS

(☏) :9434442866, M : 9002772928

Ashirbad Aptt. (Beside Aajkaal Office.) P Chaki Sarani Bye Lane, Ashrampara, Siliguri 734001, Mail- holidayaar.nb@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.